# প্রতিভূ

ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ

# প্রতিভূ

ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
ঘরোয়া তত্ত্ব সংকলন

LTBBF

লেক টাউন
বালক ব্রহ্মচারী ফাউন্ডেশন
লেক টাউন, কলকাতা

**PRATIBHU**
In-house Classes of
Thakur Sri Sri Balak Brahmachari Maharaj
Published by Lake Town Balak Brahmachari Foundation
944, Lake Town, Block-A
Kolkata - 700 089

**প্রকাশক ঃ লেক টাউন বালক ব্রহ্মচারী ফাউন্ডেশন**
৯৪৪, লেক টাউন, ব্লক-এ
কলকাতা - ৭০০ ০৮৯

**প্রথম প্রকাশ ঃ** ২০১৫
**দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ** ২০২১
**তৃতীয় প্রকাশ ঃ** ২০২৩

© গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

**মুদ্রক ঃ**
দি নিউ অরোরা প্রেস
৩, ডাফ স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

**বিনিময় ২০ টাকা**

শ্রদ্ধাঞ্জলি

# প্রাক্ কথন

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই জীব জগতে সকলের মধ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকেই সন্তান সন্ততির মাধ্যমে তাদের সৃষ্টির ধারা, কর্মের ধারা অব্যাহত রাখতে চায়। উদ্ভিদ সহস্র বীজের মাধ্যমে তার বংশের ধারা বহন করে চলে। একটি গাছ তার স্বাভাবিক নিয়মেই ফুলে ফলে ভরে উঠবে ও বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করবে এটাই প্রকৃতির নিয়ম। যদিও সমগ্র ব্যাপারটি যথেষ্ট সময় ও ঝুঁকি সাপেক্ষ। কিন্তু ঐ গাছের একটি শাখাকে যদি অতি যত্নে লালিত করে তাতে মূল বা শিকড় গজাতে সাহায্য করা হয়, তবে সহজেই ঐ গাছটির সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই শাখায় সঞ্চারিত হয়। ঐ গাছের সমস্ত গুণাবলী অপরিবর্তিত রেখে তাকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় অতি অল্প সময়ে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত এই 'কলমে'র গাছের মাধ্যমে।

পরমপিতা ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁর নিজের ব্যাপারেও এমনই এক ব্যবস্থার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে রেখেছেন তাঁর মহামূল্যবান কিছু ঘরোয়া আলাপের মাধ্যমে। ১৯৬৭ সালে ঠাকুরের অমূল্য সেই সমস্ত ঘরোয়া বক্তব্য যিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেই কালিদাস ব্যানার্জী ও তৎসহ শান্তি রায় এবং কস্তুরী গুপ্তকে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। মূল লেখাগুলিকে অবিকৃত রাখার উদ্দেশ্যে এই বইটিতে তৎকালীন বাংলা বানান-রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তথ্যগুলির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে সেই ডঃ সোমলতা চক্রবর্তীর কাছে আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি, ভক্ত-সন্তানদের প্রতি তাঁর অফুরন্ত মায়ার জন্য সেই পরম করুণাময় ঠাকুরের পাদপদ্মে জানাই শত সহস্র কোটি প্রণাম।

রাম নারায়ণ রাম

## 155, Park Street
### ২৮শে ভাদ্র, ১৩৭৪, রাত্রি সাড়ে এগারোটা

মনের কথা তো সব খুলে বলতেই পারি না। যে জায়গা থেকে আমি এসেছি, সেখানকার কথা প্রাণভরে বলার মতো তো লোকই পাই না। আমার কথা যথার্থ ভাবে বুঝবে এরকম কাউকে পেলে আমারও খুব তৃপ্তি হতো, তোমাদেরও সুবিধা হতো এমন কারুর সাথে কথা বলে আমার তত্ত্বটা বুঝে নিতে। এখন এটাই বুঝেছি যে, আমাকে বুঝতে পারবে এরকম লোক আমাকেই তৈরী করে নিতে হবে। এখানে বেশীরভাগ কথা যে আমি বলি সবই যার যার মাত্রা অনুযায়ী। কেউ হয়তো মূর্ত্তিপূজা করতে ভালোবাসে, আমার কাছে অনুমতি চাইতে এসেছে — তাকে বললাম মূর্ত্তিপূজা করো। আবার পরমুহূর্তেই অন্য আরেকজনকে বলছি মূর্ত্তিপূজা করে কি হবে? সেদিন বৃন্দাবন থেকে শ্যামামায়ের ভক্ত যারা এসেছিলো তারা যখন কৃষ্ণ সম্পর্কে জানতে চাইলো তাদেরকে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কতো কিছুই জানালাম। আবার ঐ যে কি নাম যেন, চন্দননগর না ঐদিকে থাকে, পার্টি করে (কালিদাস- রাম চ্যাটার্জীর কথা বলছো?) হ্যাঁ, হ্যাঁ — রাম চ্যাটার্জী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো কৃষ্ণের বলা গীতার ঐ শ্লোকটার ব্যাপারে। ঐ যে যুগে যুগে সাধুদের রক্ষা করতে আসবে — আরে কি যেন শ্লোকটা (কালিদাস- যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত) হ্যাঁ, হ্যাঁ — এই শ্লোকটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। আমি ওকে বললাম — বেদের যুগের বড় বড় ঋষিরা কৃষ্ণের সময়ে থাকলে এই কথা বলার জন্য কৃষ্ণকে চরম শাস্তি দিতো, কারণ এই শ্লোক মানুষকে দুর্বল করে দেবে। মানুষের উপর যখন অত্যাচার হবে তখন যদি সে তার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ না করে কৃষ্ণের আশায় বসে থাকে তাহলে তো মানুষ দুর্বল হয়ে পড়বে, সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে। কৃষ্ণের আশায় বসে থেকে থেকেই সমাজের আজ এই দুরাবস্থা। যদি কৃষ্ণ এইভাবে বলতো যে, যখন অত্যাচার হবে তখন আপনারা হাতের সামনে হাতা, খুন্তি, যা পাবেন তাই নিয়েই নেমে যাবেন এবং এই হাতাওয়ালা খুন্তিওয়ালাদের সাথেই আমি থাকবো, তাহলেও একটা নম্বর দেওয়া যেতো। রাম চ্যাটার্জী যাওয়ার সময় বলে গেলো — আপনার মতো নাস্তিক পৃথিবীতে দুটো আছে কিনা সন্দেহ।

সমস্যাটা শুরু হয় কখন, যখন বাইরে গিয়ে রাম চ্যাটার্জ্জীর সাথে ঐ বৃন্দাবন থেকে আসা ভক্তদের মধ্যে কথা হবে। একজন বলবে ঠাকুর কৃষ্ণ মানে, আরেকজন বলবে মানে না। যারা নাস্তিক বলে নিজেদের ভাবে তারা রাম চ্যাটার্জ্জীকে বলা কথাটায় খুশি হবে, আবার যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তারা কৃষ্ণের মাহাত্ম্যের কথা শুনে আনন্দ পাবে। একইভাবে কৃষ্ণ অনুরাগী যারা তারা যদি গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যাটার কথা শোনে তাহলে মনে মনে খুবই ব্যথা পাবে, আর হয়তো কোনোদিনই আমার কাছে আসবে না। এখন বোঝো আমার

অবস্থাটা! এইভাবে সবার মন রাখতে গিয়ে আমার ভিতরের সত্যিকারের চিন্তাটা যে কি চলছে তা আর বলা হয়ে উঠছে না। তবুও এতো প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও যা দিয়ে চলেছি তাতেও আমার original চিন্তা ভাবনার প্রচুর আভাস রয়ে যাচ্ছে। (কালিদাস- তাহলে তোমার অন্তরের পূর্ণ পরিচয় আমরা কিভাবে পাবো?) যে বীজ তোমাদের দান করা হয়েছে, সেই বীজ যেদিন ফুটে উঠবে সেদিন তোমরা প্রথম উপলব্ধি করবে যে তোমাদের বাবা এতোদিন তোমাদের তালে তাল দিয়ে চলেছেন। কিন্তু হওয়া উচিৎ ছিলো উল্টোটা, তোমাদেরই আমার সুরে সুরে সুর মিলিয়ে যাওয়ার কথা। তোমাদের ভিতর থেকেই সেদিন ব্রহ্মের বাণী ফুটে উঠবে। আমি আজ ক্লান্ত। ধীরে ধীরে জীবনের সূর্য্য মধ্যগগন থেকে পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়তে শুরু করেছে। রাত্রিবেলা শুতে পারি না, আমাকে বসিয়ে রাখে। দুই দিন আগে এক অদ্ভুৎ জিনিষ দেখলাম। আমার কাছে কোনোকিছুই অদ্ভুৎ না, তোমাদের মতো করে বলতে গিয়ে অদ্ভুৎ শব্দটা বললাম। রাত্রিবেলা বিশ্বপ্রকৃতি থেকে একটা অনুরোধ আসলো। খুব ছোটোবেলায় যখন কাজে বসতাম তখন এমন কেউ কেউ আসতো, হঠাৎ দেখি তারা সেদিন এসে হাজির। এসে প্রণাম জানিয়ে বললো — আপনি যদি খুশি থাকেন, তবে আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে। আপনার মতো তিনজনকে তৈরী করতে হবে। এইটুকু বলেই চলে গেলো। (কালিদাস- একটু যদি বুঝিয়ে বলো, তাহলে আমাদের সুবিধা হবে।) এই কথা আমার ঘরানার কথা, এটা কারুর বুঝানোর জন্য নয়। তোমরাও এসব কথা নিয়ে বাইরে বেশী আলোচনা করবে না। কারণ বুঝ পাকা না হলে অনেকরকম বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা নিজেরাই করে বসে। সেদিন নমিতা এসে জানতে চাইলো আমি অচল সেনকে এই বিশ্বের প্রেসিডেন্ট বলেছি কিনা! সেদিন নর্থ বেঙ্গল থেকেও কে একজন চিঠি লিখে এই প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছে। যেখানে কেউ কাউকে মানে না সেখানে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রাখার জন্য আমাকে অনেক কথা বলতে হয়। এখন আমি যদি বলি যে, এই কথা আমি বলি নি, তাহলে কাল থেকে অচল সেনকে কেউ মানবে না। আবার বেহালা থেকে আসে সমীর, আমাকে বললো প্রেসিডেন্টের কাছে থাকলে নাকি ওর অনেক উপকার হয়। আমি বললাম — বেশ। কারুর বিশ্বাসে আমি সাধারণতঃ আঘাত করি না। তবে কেউ যদি আন্তরিকভাবে জানতে চায় তখন অনেক সময় কিছু কিছু কথা খুলে বলি। মানুষ নিজের চিন্তা অনুযায়ী আমাকে বিচার করে — সেই অনুযায়ী তার মনের মতো কথা হলে খুশি হয়, আবার একটু অন্যরকম কিছু শুনলে দুঃখ পায়। কিন্তু আমার মনের একান্তের কথাটা কেউ জানতে চায় না, নিজের বুদ্ধিটাই সব সময় কার্য্যকর হয়ে চলে। নিজেরাই কিছু একটা বুঝে নিয়ে তৃপ্তি নিয়ে চললো। কোনো সময় ভুল ধরিয়ে দিলে আবার একটা নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে এসে তার কাজের সমর্থনে যুক্তি দেখায়। কিছুতেই সেই সহজ সরল স্বচ্ছ মন নিয়ে দাঁড়াতে চায় না।

আমি সেই বুঝের মাঝে হাত না দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি সেই বীজ ফোটার জন্য, যেদিন আমার সত্যিকারের মনের কথা তাকে জানাতে পারবো। কি কঠিন পথ দিয়ে যে আমি সেই শিশু বয়স থেকে এগিয়ে চলেছি তা তোমরাও বুঝতেও পারবে না। সুগারের বাড়াবাড়ি শুরু হওয়ার পর থেকে অণিমা প্রয়োগ একদমই বন্ধ করে দিয়েছি। দেহের যে কোষগুলো ব্লাড সুগারে আক্রান্ত হয়ে আছে, রাতের বেলায় অণিমা দিয়ে মিশে যাওয়ার পর আবার যখন দেহ form হতো তখন সেই একই অণু থাকতো না, অন্য অণু দিয়ে দেহ গঠিত হয়ে যেতো। কোটি কোটি অণু পরমাণু দিয়ে এই দেহ গঠিত। একটার থেকে অন্যটার তফাৎ করা যায় না। ফলে মিশে যাওয়ার আগে যে অণুগুলো ছিলো, দেহ গঠন হওয়ার পর দেখা গেলো যে তার জায়গায় অন্য অণুরা এসেছে। নতুন কোষ গঠন হওয়ার ফলে পুরোনো রোগ আর থাকতো না। যেদিন বুঝতে পারলাম এর ফলে আমার রেকর্ডে অসুবিধা হতে পারে, সেদিন থেকে অণিমা একদম বন্ধ করে দিয়েছি। এখন অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করি, স্বপ্নে যেভাবে যাওয়া হয় সেভাবে করি। স্বপ্নে যখন বেরিয়ে যাওয়া হয়, তখন দেহটা সেই আগেরটাই পড়ে থাকে -- নতুন দেহ হয় না। (কালিদাস— তুমি যে বললে রেকর্ডের কথা সেটা ঠিক আছে কি না এই বিচার কে করছে?) আমার বিচার আমাকেই করতে হয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে যতো বড়ই হোক না কেন, তার বিচার করার জন্য তারও উপরে কেউ না কেউ আছে। আমার status-টা এরকম যে বিচারের দণ্ডটা আমার উপর ছাড়া আছে, আমার বিচার করার কেউ নেই — তাই আমার বিচার আমাকেই করতে হয়। আমার আরেকটা ক্ষমতা যেটাও অন্য কারুর নেই সেটা হলো এই বিশ্বের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম অথবা বৃহৎ থেকে বৃহত্তম সর্বত্র সর্ব জায়গায়, সর্ব অবস্থায় আমি আধিপত্য করতে পারি — যা খুশি করতে পারি — তার জন্য আমার কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না। এই ক্ষমতা নিয়ে তোমাদের ঠাকুর এখানে বসে আছে আর ওদিকে কোর্টে হাজিরা দিতে হচ্ছে জমি মারার কেসে। কিন্তু কোনো সময় এক মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের সুবিধার জন্য আমি কোনো ক্ষমতা ব্যবহার করছি না। এতো কষ্ট দেখে জায়গায় জায়গায় বিশাল বিশাল মহানরা চোখের জল ফেলছে আর বলছে — তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না, তুমি চলে এসো। জীবনে দুটো পয়সা রোজগারের জন্য পাকা চুল তোলা থেকে শুরু করে কাপড় বিক্রি করা, রেডিওর দোকান দেওয়া থেকে শুরু করে কি না করেছি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও আমার spiritual ক্ষমতার advantage কখনও নিই নাই। আমার যে কারণে আসা সেটাই আমার কাছে সবকিছু। বিশ্বের সব মহানদের অনুরোধে আমার আসা। বীজের মধ্যে গাছের পূর্ণ বিকাশের ক্ষমতা রয়েছে, সব বীজেই সেই ক্ষমতা রয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বীজ হলো জীব। জীবের মধ্যে বীজাকারে এই বিশ্বের পূর্ণ ক্ষমতার সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ণ ক্ষমতার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেই চরমতম পূর্ণের জায়গায় কেউ

পৌঁছাতে পারছে না। কেউ হয়তো 99% করে ফেলেছে, কেউ আরও বেশী 99.99%, কেউ হয়তো আরও সূক্ষ্মে পৌঁছে গেছে কিন্তু কেউই পূর্ণ 100-তে reach করতে পারছে না। তখন আমার কাছে অনুরোধ আসে তুমি কি একবার birth নেবে, তাহলে আমরা যদি বুঝতে পারি পূর্ণ হওয়া আর কারুর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কেন। জন্মানোর আগে দুটো অনুরোধ রাখা হয়েছিলো — ১) আমার সব ক্ষমতা আমি ব্যবহার করতে পারবো। ২) কোথায় জন্মগ্রহণ করবো সেই ব্যাপারেও আমার বেছে নেওয়ার অধিকার থাকবে। আমি দুটো অনুরোধই অগ্রাহ্য করে নেমে পড়লাম। আমার কোনো ক্ষমতাই আমার সাথে আমি রাখিনি। যেটুকু বিভূতি তোমরা দেখো সেটা আমার সাথে সাথে হাত পায়ের মতো যেটুকু থেকে গেছে। ট্রেনটা যখন আসে তখন পাশ দিয়ে ঝড়ের মতো হাওয়া বইতে থাকে, তার জন্য কি এটা বলতে হবে ট্রেনটা ইচ্ছা করে হাওয়াটাকে নিয়ে এসেছে! তা নয়, ট্রেনটার গতির সাথে সাথে হাওয়াটা আপনিই এসে পড়ে। আমার ক্ষমতাগুলোও সেরকম — আমার ইচ্ছাকৃত নিয়ে আসা নয়, এমনি ভাবেই যেটুকু এসে পড়েছে — তাতেই দেখো কতো! এই কাজটুকুর জন্যই আমার আসা, অন্য আর যা কিছু দেখো তার সবটাই এখানকার নিয়ম কানুন অনুযায়ী চলার সুবিধার জন্য আমাকে করতে হয়। (কালিদাস- তোমার জায়গায় আর কেউ কোনোদিন আসতে পারবে না?) এটা আমি কেন বলতে যাবো। তবে এতো অনন্ত কোটি বছর যে কেউ আসেনি তা তো তোমরা জানতে পারলে। আমার নিজের মুখ থেকে এই কথা শুনতে বিশেষ ভাগ্য লাগে। এই জায়গায় একমাত্র আমার সন্তানদের মধ্যেই কেউ কেউ হয়তো আসতে পারবে, তবে সেটাও আমার খুশির উপর নির্ভর করবে। এইজন্যই হয়তো তিনজন আমি তৈরী করার অনুরোধ প্রকৃতি থেকে এসেছে। জানি না হবে কি না, কারণ কখন কোন পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে যেতে হয়। যদি কাউকে তৈরী করতে পারি, তখনই বুঝা যাবে। তবে প্রকৃতি যে চাইছে, সে ইঙ্গিত ৪৫ বছর পূর্ণ করার পর থেকেই আসছিলো। (কালিদাস- আমরা তো সকলেই তোমার মনের মতো তৈরী হতে চাই।) 6C-র বাড়িতে থাকার সময় ডঃ হরিহর গাঙ্গুলী আমাকে দেখতে এসে বলেছিলো আপনাকে কি কেউ কোনোদিন বুঝতে পারবে? গুরু নিজেও অনেক সময় জানে না কে তার ঘরানাটা বহন করবে। এনায়েৎ খাঁর বেশী বয়সের ছেলে ছিলো বিলায়েৎ। এর ফলে বিলায়েতের দিকে খুব নজর দিতে পারে নি। মাষ্টার পানু না কে একজনকে শেখানোর জন্য, কি নামটা যেন — শ্যামবিনোদ জানে -- তাকে শেখাতে গিয়ে সর্বস্ব দিলো, কিন্তু কিছুতেই পারলো না। কিন্তু এনায়েতের মৃত্যুর পর যে শোকসভা হলো, সেখানে ছোট্ট বিলায়েতের যন্ত্রে টোকা দেওয়া শুনে কোন ওস্তাদ যেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলো — আরে এ যে একেবারে এনায়েতের টোকা! গুরুর দৃষ্টি সব সময় সবার প্রতি যে এক থাকে, তাও ঠিক না। ধরো দুজন শিষ্যকে গুরু একই সাথে একই

আদেশ দিলো। দুজনের কেউই সেই আদেশ পালন করতে পারলো না। ব্যর্থ হয়ে দুই শিষ্য যখন গুরুর সামনে এসে দাঁড়ালো তখন গুরুর মনে দুরকম ভাব হলো। প্রথম জনের দিকে তাকিয়ে গুরুর যেন কোথায় একটু কষ্ট হলো, এতো শেখালাম এতো পরিশ্রম করলাম তবুও শিখতে পারলো না! ওর জায়গায় অন্য কারুর পেছনে আমি এই খাটনিটা খাটলে সে নিশ্চয়ই ভালো করতে পারতো। অন্যদিকে দ্বিতীয় জনের দিকে তাকিয়ে গুরুর মনে হলো — ও তো ওর সাধ্যমতো পরিশ্রম করেছে, আমারই নিশ্চয়ই শেখানোতে কোথাও গলদ রয়ে গেছে, যদি আরও একটু সময় দিতে পারতাম তাহলে নিশ্চয়ই সফল হতো। ওর কোনো দোষ নেই, আমিই সঠিক সুযোগের ব্যবস্থা করতে পারিনি। এই দ্বিতীয়জন সাধারণতঃ গুরুর ঘরানা পেয়ে থাকে। এই চিন্তায় যে সব সময় গুরুর নিজের হাত থাকে — তাও না। অনেক কটা factor-এর উপর সবকিছু নির্ভর করবে। তার চলন বলন, পরিবারের আপত্তি আছে কিনা, কারণ কাছে রেখে তৈরীর যে সুবিধা পাওয়া যায়, দূরে হলে একটু অসুবিধা হতে পারে। তবে মনে হয় প্রকৃতি থেকে যখন অনুরোধ এসেছে, প্রকৃতি থেকেই কাউকে হয়তো আমার কাছে পাঠানো হবে। আমি নিজে বেছে নিতে গেলে অসুবিধা হবে, কারণ আমার মায়াটা এতো বেশী যে বাছাবাছি করা আমার পক্ষে কঠিন হবে। প্রকৃতি থেকে পাঠানো হলে আমার বাছবিচার করার কোনো দায়িত্ব থাকলো না, কারুর কিছু বলারও রইলো না। (কালিদাস- তিনজনকেই কি প্রকৃতি পাঠাবে?) তা আমি কিভাবে বলবো? তিনটাও হতে পারে, একটাও হতে পারে আবার কোনোটাই নাও হতে পারে। এখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, সবই আমার পূর্ণ খুশির উপর নির্ভর করবে। তবে হলে প্রকৃতির কাজের পক্ষে যে খুব সুবিধা হবে এটুকু বলতে পারি। (কালিদাস- তোমার যে এতো শিষ্য, তারাও তো তোমার সন্তান। তাহলে তারাও তো স্বাভাবিক নিয়মে পিতার সম্পত্তি পাবে।) আমি যে তোমাদের সন্তান করেছি এটা তোমাদের উদ্ধারের জন্য। তোমাদের এখনকার মাত্রা আর আমার মাত্রার তফাৎটা তোমরা এই মুহূর্তে চিন্তাতেও আনতে পারছো না। যারা চলে গেছে, তারা কিছুটা এখন বুঝছে। অশ্বিনী চ্যাটার্জ্জী মুন্সীগঞ্জে মৃত্যুর সময় বলছে — ঠাকুর! তুমি কোথায় আর আমরা কোথায়, অবাক হচ্ছি তোমার সাথে আমাদের দেখা হলো কি করে? অশ্বিনী যাওয়ার সময় স্বামীবাগ বাড়িতে আমার সাথে দেখা করে গেছে। রবি ঘোষ ও মহম্মদ আলী তখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো, ওরাও অশ্বিনীকে দেখেছে কিন্তু ভেবেছে অশ্বিনী বুঝি এমনিই আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। পরে সন্ধ্যাবেলায় মুন্সীগঞ্জ থেকে যখন খবর আসলো তখন বুঝলো। খুব সাধারণের মতো তোমাদের সাথে মিশি বলে তোমরা এখন আমাকে বুঝে উঠতে পারছো না। ফলে এই বীজ পূর্ণ রূপে ফুটে উঠতে বহুদিন লেগে যাবে। মৃত্যুর পরে আরেকটা অবস্থায় তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানে আবার আরও উঁচুতে ফুটে

ওঠার পথ বলে দেওয়া হবে। এইভাবে চলতে চলতে কবে যে সেই পূর্ণ অবস্থায় যাবে এই মুহূর্তে তা বলা কঠিন। এখানেই এমন অনেক বীজ আছে যেমন তালগাছ — যা একজন পুঁতলে তিন চার পুরুষ পরে ফল পায়। ফলে বীজ থেকে ফুটে উঠতে অনেক সময়ের ব্যাপার। তারপর ফুটে ওঠার পর ঠিকমতো জল দেওয়া, সার দেওয়া — এসব তো লেগেই আছে। তারপর আবার হয়তো দেখা গেলো যদিও বা একটু ফুটে বের হলো — তাও আবার ছাগল বা গোরু এসে খেয়ে গেলো। তার জন্য বেড়া দিয়ে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা। সবকিছু করেও দেখা গেলো এমন একটা ঝড় হলো, গাছটা ভেঙ্গে গেলো। এইসব করে ফল দিতে দিতে অনেক দেরী হয়। কিন্তু কলমের গাছ খুব অল্প দিনের মধ্যে পরিণতি পায়, কারণ direct ঐ গাছের অংশ ওর মধ্যে থাকে। একটা সন্তান করা হচ্ছে উদ্ধারের ব্যবস্থা করার জন্য, সাথে সাথে যতোটা তৈরী করা যায়। আরেকটা হলো শুধুমাত্র তৈরীর চিন্তা নিয়ে কাজ করা। কলমের গাছ যেভাবে তৈরী করে সেভাবে যদি কাউকে তৈরী করতে পারি, তবে সে খুব দ্রুতগতিতে আমার বুঝগুলি বুঝে নিতে পারবে। বীজ থেকে গাছ তৈরী করতে যেখানে বহুদিন লেগে যায়, কলমের গাছের ক্ষেত্রে কিন্তু তার চেয়ে অনেক কম সময়ের মধ্যে সে ফুটে উঠতে পারবে। যেমন সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর লিফটে ওঠা। সিঁড়ি দিয়ে যে উঠছে তাকে কতো কষ্ট করে উঠতে হচ্ছে, হার্টের পেশেন্ট হলে তো মাঝপথে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু লিফটে যে উঠছে সে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ৫০ তলায় চলে যাবে। সিঁড়ি দিয়ে যে উঠছে সে প্রত্যেকটা তলার খবর নিতে নিতে উঠবে আর লিফটে ওঠা ব্যক্তির কাছে নীচের তলা আর ৫০ তম তলার খবর থাকবে — অন্য কোনো তলার খবর থাকবে না। কলমের গাছ যারা তারা ঐ লিফট দিয়ে ওঠা ব্যক্তির মতো, যেহেতু তাদের speed অন্যদের থেকে অনেকটা বেশী তারা আমাকে তখন অনেকটা বুঝতে পারবে। যে যে stage দিয়ে pass করতে অনেক সময় লেগে যায় সেইসব stage ওরা অনায়াসে খুব অল্প সময়ে pass করে চলে যাবে। এই বিশ্বে আমার গতি খুব বেশী হওয়ার জন্য আমার সাথে তাল রাখার ব্যক্তির বড় অভাব। তাই হয়তো বিশ্বপ্রকৃতি থেকে এই কলমের গাছের অনুরোধ এসেছে। তবে আমিও এটা প্রকৃতির উপরই ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি থেকে কাউকে নিশ্চয়ই পাঠাবে। তবে সবকিছুই নির্ভর করবে আমার খুশির উপর। এটা জোর করে করার জিনিষ নয়, একমাত্র খুশি থাকলেই আমি করতে পারবো। তখন আমার তত্ত্বটা তার মধ্য দিয়ে reflected হবে। তবে বীজ থেকে কি হবে না? নিশ্চয়ই হবে। আমার কোনো বীজই অযথা নষ্ট হবে না, সব বীজই ফুটে উঠবে। সেই চিন্তা নিয়েই তো আমি দীক্ষাটা দিয়েছি। কিন্তু বীজ থেকে পূর্ণ গাছ ফুটে উঠতে সময় অনেকটা লাগছে বলেই প্রকৃতির এই কলমের চিন্তা।

রাম নারায়ণ রাম

## 155, Park Street
## ২রা আশ্বিন, ১৩৭৪, 19th Sept, 1967

সেদিন যে কলমের গাছ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, আজ দেখি ধীরেন ঘোষ এসে জিজ্ঞাসা করছে সেদিনের আলাপ সম্পর্কে। এই কথা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কথা, এটা বাইরে জানানোর কথা নয়। আমি আমার আধ্যাত্মিক পরিচয় কোনোদিন বাইরে প্রকাশ হতে দিতে চাইনি। আমি পৃথিবীতে এসেছি সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত কাজে। আমার কাজ complete করে, আমার record ঠিক রেখে যাতে আমি চলে যেতে পারি এটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। যাওয়ার সময় আমি আমার খুশি মতো প্রচুর নিয়ে যেতে পারবো, এমনকি আমার কাছেও রেখে দিতে পারবো — এই স্বাধীনতা Universe থেকে আমাকে দেওয়া আছে। এই স্বাধীনতা দেওয়া আছে বলেই যে আমি ব্যবহার করবো তাও না। একমাত্র ব্যবহার করতে পারবো যদি আমি কারুর উপর সম্পূর্ণ খুশি থাকি। এখন আমি কঠিন আইনের মধ্যে দিয়ে চলছি। নিজের সুবিধার জন্য আমি এতোটুকু ক্ষমতা ব্যবহার করি না। এই জগতে আমার নামে চারিদিকে কতো বদনাম, শিশুবয়স থেকে কতো অপবাদ, অপমান, লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে - তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার যায় আসবে তখনই যদি আমার সুনামের জন্য আমি আমার ক্ষমতার অপব্যবহার করি — তাহলেই একমাত্র আমার record-এ spot পড়বে। সামান্য ৭০/৮০ বছরের মোহে পড়ে আমি আমার অনন্ত বছরের এতো সুন্দর record নষ্ট হতে দিতে পারি না। তাতে তোমরা যদি আমাকে ভুল বোঝো আমার কিছু করার নেই। আজ ভুল বুঝলেও যেদিন এখান থেকে চলে যাবে সেদিন বুঝতে পারবে আমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে গেছি। এই যে সেদিন দ্বিজেন চক্রবর্ত্তী মারা গেলো — কবে যেন মারা গেলো (কুসুমদি- ১৬ তারিখ) হ্যাঁ, আমি শ্মশানে গেছিলাম। ওর ছেলে মরণাপন্ন ছিলো, আমার কাছে কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলো — আমি বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম। সেই ছেলে এম এস সি পাশ করেছে। দ্বিজেন রোজ এসে আমাকে গান শোনাতো। (কুসুমদি- খুব ভালো গান করতো, ওর বাবাও গান গাইতো।) যদি এখন দ্বিজেন এসে তোমাদের সামনে দাঁড়ায় তাহলে ও বলবে — এতোদিন ও ঠাকুরকে যা বুঝেছিলো, ঠাকুর যে তার থেকে কতোখানি বড় তা এখন ও বুঝতে পারছে। আমি তো ঐ জগতের কথা বিশেষ বলি না, এখানকার সামাজিক পরিবেশের ও তোমাদের কাজকর্মের চাপে ঐ দিকটা এক প্রকার ঢাকাই থাকে। কিন্তু প্রকৃতি থেকে বার বার অনুরোধ আসছে যাতে আমি ঐ দিকটা নিয়েও একটু ভাবনা চিন্তা করি। ছোটোবেলায় যখন হিমালয়ের দিকে একটু যাতায়াত ছিলো, তখন কিছু কিছু কাজ করা হয়েছে। পাহাড়ে এখনও খুব বড় কিছু সাধক আছে। তারা আমার কাছে আসতে

পারে না। আমি যে এসেছি, প্রকৃতি থেকে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ধরো চার আনা - এই চার আনা মাত্রার মধ্যে যারা আছে তারাই আমার সান্নিধ্যে আসতে পারবে। এর উঁচুতে যারা আছে তারা আসতে পারবে না। (কালিদাস- আমাদের মাত্রা তাহলে চার আনা।) চার আনাটা কথার কথা বললাম, বুঝাবার সুবিধার জন্য। এখন এই চার আনা মাত্রার উপরে যারা আছে, তারা আমাকে বুঝতে পারছে কিন্তু আমার কাছে তোমাদের মতো আসতে পারছে না, যেহেতু প্রকৃতির আইনে বলা আছে আমি যতোদিন দেহ নিয়ে এই পৃথিবীতে থাকবো ততো দিন চার আনা মাত্রার উপরে কেউ আমার সান্নিধ্যে আসতে পারবে না। এই যে লোকনাথ ব্রহ্মচারী অশ্বিনীকে অর্দ্ধ মন্ত্র দীক্ষা দিয়েছিলো এটা আর কিছু না, কারণ লোকনাথ ও ত্রৈলঙ্গ বুঝতে পেরেছিলো যে একজন পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী মহান এই পৃথিবীর বুকে আসছেন। তারা যে মাত্রায় আছে সেটা তোমাদের থেকে অনেক উঁচুতে হওয়ার জন্য তারা আমার কাছে আসতে পারবে না, তাই অশ্বিনীর মাধ্যমে একটা যোগাযোগ রাখলো। অশ্বিনী দেহত্যাগের পরে আমার সাথে স্বামীবাগ বাড়িতে দেখা করে বললো যে লোকনাথ বাবা ও দাদু এসেছিলো, তোমাকে প্রণাম জানিয়েছে। যেহেতু ত্রৈলঙ্গ লোকনাথের গুরু ছিলো তাই অশ্বিনী ত্রৈলঙ্গকে দাদু বলে ডাকতো। ঐ সময় রবি ঘোষ ও মহম্মদ আলি আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল — ওরাও শুনেছে এ কথা। আমি ঠিক করে এসেছি যে এই চার আনা মাত্রার বাইরে তাকাবো না, তাই এই সামাজিক পরিবেশে কোর্ট কাছারি কেস, তোমাদের মান অভিমান সব সহ্য করে চলেছি। তাহলে এই উঁচু মাত্রার যারা আছে, যারা আমাকে অনেকটা বুঝতে পারছে, তাদের আরও উন্নতির কি ব্যবস্থা করা যায় এই চিন্তা থেকেই হয়তো কলমের গাছের চিন্তা এসেছে। যিনি ভগবান হয়ে পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে আসেন, তিনি এই বিশ্ব বিরাটের প্রতীক। বিরাট নিয়েই তার সব লীলা খেলা ও কর্ম। এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ভাগ্য নিয়ন্তা তাকেই বলা চলে। সব স্থান ও কাল জুড়ে তার অবস্থান, তাই কোনো নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে তিনি নেই, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হতে হলে ওঁনাকে এক গণ্ডীর ভিতর আসতে হয়। সমাজ ও পরিবেশের তারতম্য অনুযায়ী ওঁনাকে চলতে হয় এবং নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। যেমন শীতের দেশ দার্জিলিং-এ শীত বস্ত্রের দরকার, ওঁনাকেও তাই সেখানে শীত বস্ত্র পরিধান করতে হয়। বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত বিধানই ওঁনার পরিচালনাধীন — আইন যিনি করেন তাঁরও যে সেই আইন অনুসারে চলতে হয়। বিরাটকে যিনি পরিচালিত করেন — তাঁরই আয়ত্তাধীনে যখন সবকিছু চলে, তখন প্রশ্ন আসতে পারে তাঁর এই পৃথিবীতে আবির্ভাবের দরকার কি? বিরাটেরই তো অতি সামান্যতম অংশ এই পৃথিবী। জন্মসিদ্ধ যিনি তিনি আসেন বিরাটের কাজের জন্য। সাধারণতঃ মানুষের যা আয়ু ততোটুকু সময়ই তিনি এই পৃথিবীতে অবস্থান করে কাজ

করে যান। এই সামান্য সময় — ৬০/৭০/৮০ বৎসর — কাজের তুলনায় অতি কম সময়। এই সময়ের মধ্যে যতোটা বেশী করা যায় ততোটুকু কাজ তিনি করে যান। ধরা যাক ৪০ লক্ষ শিষ্য করলেন। তাদের কাজ দিয়ে, তাদের কাজের সুযোগ সুবিধা করে দেন যাতে তারা বিরাটের কার্য্যের উপযোগী হয়ে বিরাটের কাজ করে যেতে পারে। তিনি বিরাট স্বয়ং ভগবান — সম্পূর্ণ নিজের খুশিতে নরদেহে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি দীক্ষা দিলেই আর জন্ম মৃত্যুর ছকের মধ্যে পড়তে হয় না। তার মানে এই নয় যে তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের কাজ শেষ হয়ে যায়। এই পৃথিবী তো একটা stage মাত্র। এই stage হতে তারা different stage-এ যায় বিরাটের কাজের জন্য। এই ৪০ লক্ষ শিষ্য হতে আবার তিনি বেছে বেছে নিজের খুশি অনুযায়ী কয়েক জনকে sanction দিয়ে যান — ধরা যাক ১০ হাজার — তারা sanction world-এ যায়। লেখা আছে, ২১ হাজার কোটি জন্ম ২১ ঘণ্টা করে সাধনা করলে যে ফল হয়, sanction পেলে তার অধিকারী হওয়া যায়। স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে গুরুপ্রদত্ত ধ্যানে মগ্ন থাকলেও এক জীবনে sanction পাওয়ার মতন কাজ কিছুই হয় না। এটা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে গুরুর Sweet Will-এর উপর, শুধুমাত্র ভালোবাসার জোরে তিনি sanction দিতে পারেন। Sanction দেবার সময় যে উনি শিষ্যদের কার্য্যকলাপের বিচার বিবেচনা করে দেন — সব সময় তা নয়। একেবারে whimsical ব্যাপার। খুশি হলেন — দিয়ে দিলেন। গুরুর ভালোবাসা পেতে খুব বেশী বেগ পেতে হয় না যদি গুরুর প্রতি সামান্য একটু ভক্তি ও ভালোবাসা থাকে। এর জন্য বলতে গেলে কোনো কষ্ট করার দরকারই হয় না। (কালিদাস— তুমি যে কলমের গাছের কথা বলছো, সেটা কি এই sanction পাওয়ার মতন ব্যাপার?) না, ঠিক সেরকম না। Sanction যারা পাচ্ছে তারা আমার শিষ্যদের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ পাচ্ছে। ঐ যে আগেই বললাম জন্মগত ভাবে চার আনা মাত্রার মধ্যেই তারা হবে। কিন্তু প্রকৃতি থেকে যে কলমের গাছের কথা বলা হচ্ছে তাকে যেহেতু প্রকৃতি থেকেই পাঠাবে সেই কারণে তার জন্মগত মাত্রা চার আনার উপরেও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে - সেটা আমার তাকানোর বিষয় না। একটা হচ্ছে উদ্ধারের চিন্তা করে, আর একটা প্রকৃতির বিরাট কাজের সহযোগিতার কথা চিন্তা করে। (কালিদাস- আমাদের মধ্যে কেউ কি সেরকম আছে?) এটা আমার বলার কথা নয়। হয়তো এখনও সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই করেনি। আমি তো সোজা ভাবে কখনও কিছু সচরাচর বলি না। শত আড়ালের মধ্যে দিয়ে আমি লুকাতে চাই। এই পৃথিবীটা একটা হাটের মতো, যেখানে সব রকম মানুষের আনাগোনা হয়। হাটে গরীবও যায়, বড়লোকও যায়। হাটে সবার সাথে সবার দেখা সাক্ষাৎ হয়। রাজাও অনেক সময় শখ করে হাট দেখতে আসে। তখন অনেকের সাথে রাজার দেখা হতে পারে। হাট থেকে ফেরার সময় রাজা ইচ্ছা করলে কোনো গরীব লোককে তার সাথে

নিয়েও যেতে পারে, তার রাজবাড়িতে কোনো কাজ দিয়ে তাকে চিরকালের জন্য রেখেও দিতে পারে। আগের দিন পর্য্যন্ত যে না খেয়ে ছিলো, দেখা গেলো হাটে রাজার সাথে দেখা হওয়ায় সে এখন রাজবাড়িতে বিশাল প্রাচুর্য্যের মধ্যে আছে। কখন যে কি হয়, কিছুই বলা যায় না। হাটে গিয়ে আমার তো জানানোর প্রয়োজন নাই আমি কে বা কোথা থেকে এসেছি! তবে কেউ যদি আমার চলন বলন দেখে বুঝে নেয় আমাকে তাহলে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার — আমি তো তাকে বুঝাতে চাইছি না। রাজা যে কাউকে নিয়ে গিয়ে তার বাড়িতে রেখে দিলো এটা করতে রাজা বাধ্য নয়, এটা সে তার নিজের খেয়াল খুশি মতো করলো। সেটা তার সম্পূর্ণ নিজের খুশিতে, সেখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এটা না করলেও রাজাকে কারুর কাছে জবাবদিহি করতে হতো না। Sanction যারা পাচ্ছে তারা এই শ্রেণীর। কলমের গাছ যে হবে সে হয়তো রাজার ঘরানাটা বহন করে নিয়ে যাবে। জন্মের থেকে আমি যে সহজ সরল ঘরানাটা নিয়ে এসেছি, সেই সুন্দর ঘরানার ছোঁওয়া এখানে দেখতে পাই না। বেশীর ভাগ লোকই নিজের নিজের ভাবনা অনুযায়ী আমার তত্ত্বটাকে ব্যাখ্যা করে এবং তারপরে সেই ব্যাখ্যাটাই ঠাকুরের কথা বলে বাজারে চালু করে। আমি কারুর সম্মানে আঘাত দিই না। বলু বিশুর কেসের সময় রায়ের কোয়ার্টারে অচল সেনকে বলেছিলাম — আমার হাতে কিছু নেই, তোমরা যা পারো করো, আমি আমার জন্য কিছু করতে পারবো না। এই কথাতে অচল সেনের ওখানে নাকি আলোচনা হয়েছে যে, ঠাকুর যখন অচল সেনের থেকে সাহায্য চেয়েছে তখন অচল সেন কতো বড় মহাপুরুষ! আমি তো ঠিক সেই অর্থে কথাটা বলিনি। যখন ছোটো ছিলাম তখন ক্ষুধা পেলে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে মাকে বলতাম কিছু খেতে দেওয়ার জন্য। ঠিক সেরকম মন নিয়ে, সন্তান জ্ঞানে আমি কথাটা বলেছিলাম। এখানে মহাপুরুষ অথবা অন্যকিছুর কথা আসছে কেন? আমি যেভাবে সহজ সরল মন নিয়ে তোমাদের সাথে মিশি, তাতে তো আমাকে বুঝতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়! শিশু বয়স থেকে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে আমি গেছি। কিন্তু কখনও আমার spiritual advantage আমি কখনও নিই নাই, তাই আমার record-টা এখনও খুব ভালো আছে। রাতের বেলা প্রকৃতি আমাকে বসিয়ে রাখে আর বলে — তুমি যে এদের পিছনে এতো পরিশ্রম করছো, এরা তো তোমাকে বুঝতে পারছে না! আমি বলি — আমি আমার আপন মনে, অন্তরের প্রাণঢালা ভালোবাসা দিয়ে, নিঃস্বার্থ ভাবে আমার কাজ করে চলেছি। কারুর কাজে লাগছে কিনা এটা দেখতে গেলেও একটা স্বার্থের গন্ধ আসতে পারে, তাই সেদিকেও আমি তাকাচ্ছি না। আমি শুধু আমার আপন মনে জন্মের থেকে যে সুর নিয়ে এসেছি সেই সুর বাজিয়ে চলেছি। ১৫ বছর বয়সে যেবার পাহাড়ে গিয়েছিলাম, সেই সময় পাহাড়ে এক অপূর্ব জায়গায় একটা পাখির গান শুনেছিলাম। কি অপূর্ব সেই সঙ্গীত! আমার সাথে

সেইবার সরিষাচরের অমল ছিলো। ওকে বললাম এরকম পাখির গান কোথাও শুনেছিস! অমলও ভীষণ অবাক হয়ে শুনছে। কি অপূর্ব সেই সুর -- ভাষায় বর্ণনা দেওয়া যায় না। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম আমরাই শুধু সেখানে অন্য কেউ নেই। সেই পাখি যখন গান গাইছিলো কেউ তার গান শুনছে কিনা এই ভেবে কি সে সুর দিচ্ছিলো? তা তো নয়। সে তার আপন মনে গান গাইছিলো — কারুর কাজে লাগলো কিনা, কেউ তারিফ করলো কিনা এতোকিছু ভেবে সে তার গান গাইছিলো না। মেঘ যে ডাকে, সমুদ্রের যে গর্জ্জন, বাতাসের যে আওয়াজ-এরা কি এই ভেবে করে যে কেউ যখন আমাদের তারিফ করছে না, আমরা আর কাজ করবো না। সেটা তো করে না! আমিও ঠিক সেই মন নিয়ে আমার কাজ করে চলেছি। তবে আমার এই মনটাকে ধরে রাখার জন্যই হয়তো প্রকৃতির থেকে এই কলমের গাছ পাঠানোর চিন্তা করা হয়েছে। পাহাড়ে গিয়ে দেখেছি এখনও কিছু বড় বড় সাধক আছে — সাধনা করে চলেছে। কিন্তু আমি যে জগৎ থেকে এসেছি সেখানকার বার্তা এখনও ওদের কাছে অজানা। কাছাকাছি যে সমস্ত গ্রহ আছে সেই সাপেক্ষে তারা অনেকটা এগিয়ে গেলেও আরও এগিয়ে যাবার রাস্তা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিচ্ছে না। আমি পৃথিবীতে আসাতে যোগীদের মধ্যে অনেক বড়লোক হঠাৎ গরীব হয়ে গেছে। উজানচরে যখন ছিলাম তখন সেখানে শ্যামেদের বাড়িতে আমাদের যাতায়াত ছিলো। (কালিদাস- অমলেন্দু শ্যামেদের কথা বলছো?) হ্যাঁ। শ্যামেরা আমার চোখে খুব ধনী ছিলো। আমার বাবার রোজগার খুব বেশী ছিলো না, তার উপরে কাছারি বাড়ি থেকে যা মাইনে পেতেন তার একটা অংশ মেদিনীমণ্ডলে পাঠাতে হতো। ছোটোবেলায় দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। শ্যামেরা বড়লোক ছিলো — বড় বড় পাত্রে মুড়ি, চিঁড়া ভরা থাকতো। আমার কাছে শ্যামেরা তখন সব থেকে বড়লোক। আমার বাবার সাথে কাজ করতেন আশু সেন, আমি তাকে জ্যাঠামশাই বলে ডাকতাম। জ্যাঠামশাই আমাকে প্রথম ঢাকা শহরে নিয়ে যান। ঢাকা শহরে গিয়ে নবাব বাড়ি দেখে আমি তো অবাক! বুঝলাম এরা শ্যামেদের থেকে অনেক বড়লোক। এই বাড়ির অনেক সাধারণ কর্মচারীর অর্থের পরিমাণই শ্যামেদের থেকে বেশী। সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম যাদের আমি সবচেয়ে ধনী লোক ভেবেছিলাম, তাদের চেয়েও অনেক ধনী রয়েছে। ঠিক সেরকম কাছাকাছি গ্রহদের সাপেক্ষে যে সমস্ত যোগীরা খুবই বড়লোক ছিলো, আমার পৃথিবীতে আসাতে এমন এক জগতের বার্তা এসে পৌঁছেছে তার ফলে সেই সমস্ত যোগীরা মুহূর্তে খুব গরীব হয়ে গেছে। ক্লাস টুয়ের তুলনায় ক্লাস টেন অনেক বড় — কিন্তু সেই ক্লাস টেন আবার মাস্টার ডিগ্রী যে করেছে তার তুলনায় কিছুই না। যারা এতোদিন ক্লাস টেনে থেকে শান্তিতে ছিলো তাদের সামনে হঠাৎ ডক্টরেট করা কেউ এসে হাজির হলে যেমন অবস্থা হয় — সেরকম একটা অবস্থা হয়েছে। আমি যে জগৎ থেকে এসেছি সেই মাত্রায় sanction যারা পেয়েছে

তাদের পৌঁছাতেই যে কতোদিন লাগবে তার ঠিক নেই। তাই এই কলমের গাছের চিন্তা এসেছে, যাতে অল্প সময়ের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি অনেক দিনের কাজ সম্পন্ন করা যায়। আগে গোরুর গাড়িতে করে, ঘোড়ায় চেপে দিল্লী যেতো — কতো সময় লাগতো ভাবো তো! মাসখানেক বা তার বেশীই হয়তো লাগতো। এখন ট্রেনে সেখানে দিল্লী যেতে প্রায় ২১/২২ ঘণ্টা লাগে, আবার প্লেনে আড়াই/তিন ঘণ্টাতেই পৌঁছে যেতে পারে। আমি তো চার আনার আইনে পড়ে আটকে আছি, তাই বড় বড় যোগীদের কথা ভাবতেই পারছি না। কলমের গাছ হয়ে যিনি আসবেন তিনি তাদেরকে পথ দেখাবেন। তাদের আকুল প্রার্থনাতেই হয়তো কলমের গাছ জন্ম নেবে। আমি তাকে আড়াল করে রাখবো, আমার মনের মতো করে তৈরী করবো। এখানে ছাত্র পড়ানোর মাস্টার অনেকেই দেখেছে কিন্তু মাস্টারদের পড়াতে পারে এমন মাস্টার কেউ দেখেনি। বড় বড় যোগীরা যারা দেবতুল্য হয়ে গেছে, তারা ওর পায়ে পড়ে থাকবে। ওর একটা ইচ্ছাতে ওদের অনেক রাস্তা খুলে যাবে। পাহাড়ের বেশীর ভাগ সাধকই তাদের নিজ নিজ গুরুকে surpass করে গেছে। এখন তাদের পথ দেখাবার কেউ নেই। তোমাকে ক্লাস টুতে যিনি পড়িয়েছেন, তিনি হয়তো টেন অবধি পড়েছেন। তার পক্ষে ক্লাস টু পড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু তুমি নিজে যখন বিএ পড়বে তখন তার পক্ষে তোমাকে পড়ানো আর সম্ভব হবে না। তখন আরও উঁচুতে পড়া মাস্টার চাই। অনেক যোগীরও আজ সেই অবস্থা। তাদের পথনির্দেশ করবার জন্যই হয়তো এই কলমের গাছের চিন্তা। চাঁদের যেমন নিজস্ব আলো নেই — সূর্য্যের আলোতে চাঁদ আলোকিত, ঠিক সেরকম যে আসবে কলমের গাছ হয়ে তারও নিজস্বতা বলে কিছু থাকবে না। আমার শক্তিটাই ওর মধ্যে reflected হবে। যে কোনো stage-এরই হোক না কেন, যতো উঁচুতেই কোনো যোগী থাকুক না কেন, সব stage-এর উপরেও মাস্টারী করতে পারবে। (কালিদাস- আমরা তাকে চিনতে বা জানতে পারবো না?) তোমাদের চেনা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে তো সে আসছে না, যারা চেনার তারা ঠিকই তাকে চিনে নেবে। তোমরা ওকে নিয়ে কি ভাবলে সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা হলো যারা খুব উঁচু stage-এ চলে গেছে তারা ওকে কাছে পাবার জন্য পাগল হয়ে যাবে। ছোটোবেলায় পৈতার পরে যেবার পাহাড়ে গেলাম তখন একটা অঞ্চলে গিয়েছিলাম। ওখানে বাইরের লোক কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। সেখানে শিব বসে সাধনা করেছিলেন। শিবের সেই সাধনার আসন আজও আছে। চারিদিকে বড় বড় সাপ, বাইরের কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না। সাপেরা আজও শিবের সেই আসন পাহারা দিয়ে চলেছে। সেই জায়গা থেকে একটু দূরে বড় বড় কিছু সাধক এখনও সাধনা করে চলেছে। আমি ঘুরতে ঘুরতে সেই জায়গায় এসে পড়েছিলাম। ওখানে যোগীদের মধ্যে এই প্রবাদ চালু আছে যে, শিবের সেই ফাঁকা আসনে যে বসে সাধনা করবে তাকেই তারা শিবতুল্য

বলে মেনে নেবে। সেই ছোটো বয়সে ঐ আসনের সামনে দাঁড়িয়ে আমার সেদিন এই কথা মনে হয়েছিলো যে, আমার কোনো সন্তান একদিন এই আসনে বসবে। আমার সেদিন দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিলো — চোখ মুছে তাকাতেই দেখি কিছুটা দূরে শিব দাঁড়িয়ে আছেন হাত জোড় করে, ওনারও দুচোখে জল। ছোটো বয়সের সেই চিন্তা কিছুদিন হলো ঘুরে ঘুরে আসছে। সেরকম কাউকে তৈরী করতে পারলে পাহাড়ের সাধকদের খুব উপকার হয়, বিশেষ উপকার হয়। অনেক দূরের পথ তারা খুব তাড়াতাড়ি অতিক্রম করতে পারবে। আমি তো চার আনার আইনে আটকে পড়েছি বলে ঐ স্তরের যোগীরা আমার কাছে আসতে পারছে না। কিন্তু আমার সেই সন্তানের কাছে আসতে তাদের কোনো আইনে আটকাবে না। (এইসময় বাড়ির ফোন বেজে ওঠে। ফরোয়ার্ড ব্লকের অমর চক্রবর্ত্তী ফোন করে জানিয়েছে যে যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় আগামীকাল গুরুদেবের সাথে দেখা করতে চাইছেন। গুরুদেব অমর চক্রবর্ত্তীকে সম্মতি জানাতে বললেন এবং অজিত ভট্টাচার্য্যকে ডেকে পাঠালেন। যে বিষয়ে আলোচনা করছিলেন সেই বিষয়ে পরে আলোচনা করবেন এই কথা বলে গুরুদেব এটা জানালেন যে এই আলাপ যেন নিজেদের মধ্যেই ঘরোয়াভাবে থাকে।)

রাম নারায়ণ রাম

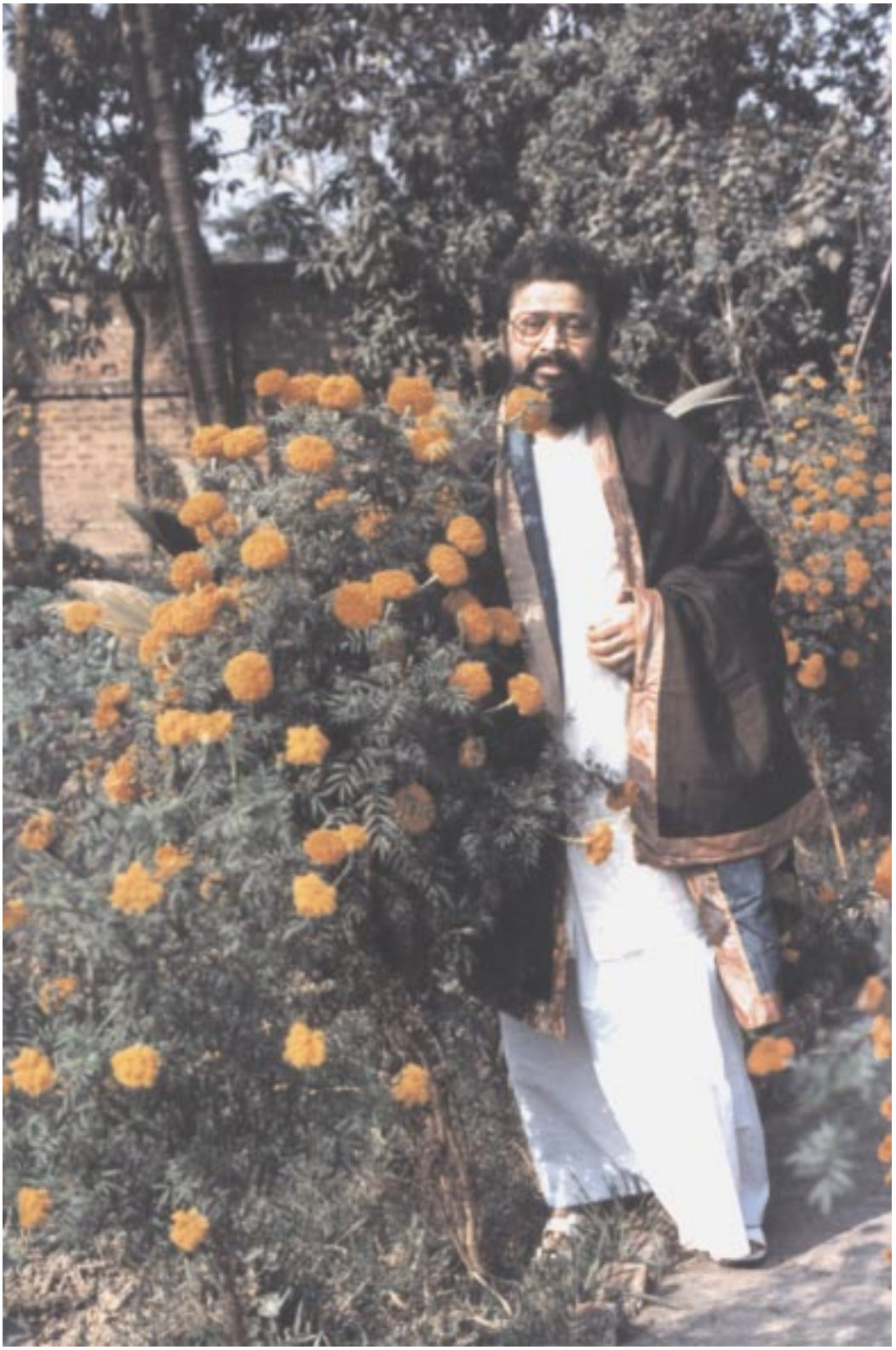

## 155, Park Street
## 21-9-1967

আজকে যে এসেছিলো, প্রণবেশ চক্রবর্ত্তী — স্কুল মাস্টার — আমার কথা শুনে আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। বিক্রমপুরের মালখানগরে আমাকে এক ভক্তের বাড়িতে দেখেছিলো — আমার বয়স তখন ১৪-১৫ বছর হবে। ওর এক আত্মীয়ের থেকে খবর পেয়েছে যে আমি এখন পার্ক স্ট্রীটে থাকি, তাই দেখা করতে এসেছে। সে আনন্দময়ী মায়ের কাছে এক সময় যাতায়াত করতো। একবার চট্টগ্রামের ঐ দিকে কি একটা গ্রামে আমাকে মণিকুন্তলা রায় আর ওর ছেলে রামানন্দ নিয়ে গিয়েছিলো। মণিকুন্তলা রায় হলো জ্যোতিষ রায়ের স্ত্রী, ওর একমাত্র ছেলে রামানন্দকে আমি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। জ্যোতিষ রায় ছিলো আনন্দময়ীর প্রধান ভক্তদের একজন। মণিকুন্তলা রায় যে গ্রামে আমাকে নিয়ে গেলো, তার পাশের গ্রামেই আনন্দময়ী মাও তখন ওখানে এসেছিলো। আমি জানতাম না যে পাশের গ্রামেই আনন্দময়ী আছে। আনন্দময়ী মায়ের সাথে আমার তার আগে ২/১ বার দেখা হয়েছে। রামানন্দকে বাঁচিয়ে দেবার পর আনন্দময়ী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। ঢাকায় স্বামীবাগে ভোলাগিরির আশ্রমে একটা বড় পুকুর ছিলো, আমি ঐ পুকুরে স্নান করতে যেতাম। মণিকুন্তলার থেকে আমার কথা শুনে আনন্দময়ী আমার সাথে স্বামীবাগে মামাবাড়িতে দেখা করতে এসে শুনেছে যে আমি ভোলাগিরির আশ্রমে, তখন আনন্দময়ী আমার সাথে ভোলাগিরির আশ্রমে দেখা করে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলে জড়িয়ে ধরেছিলো। আরেকবার বোধহয় টেকাটুলিতে শ্যামাবাসে কামিনী জজের বাড়িতে আনন্দময়ী এসে দেখা করেছে। ঢাকায় ওকে শাহবাগের কালী বলে ডাকতো। মণিকুন্তলা যে গ্রামে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো, সেই গ্রামে আমি তো সকাল বেলা দাঁতন করছি আর গ্রামের রাস্তায় পায়চারি করছি। আমার সাথে সুরেশ নামে একজন ভক্ত ছিলো, প্রিয়প্রসাদ ওকে চিনতো। হঠাৎ মণিকুন্তলা হন্তদন্ত হয়ে এসে আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়িতে আসতে বললো। আমি তাড়াতাড়ি দাঁতন করা শেষ করে মুখ হাত পা ধুয়ে ফিরে আসলাম। আমি ঘরে ঢুকতেই দেখি মণিকুন্তলা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। আমি তো বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার, মণিকুন্তলা তখন খাটের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করায় ভালো করে তাকিয়ে দেখি কে একজন খাটে বসে আছে — চেনা চেনা লাগছে — হঠাৎ খাট থেকে নেমে এসে আমার পায়ে প্রণাম করে বলছে — নারায়ণ, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি তখন বুঝতে পেরেছি যে, এ হলো আনন্দময়ী মা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম — তুমি আনন্দময়ী মা তো? ও খালি এক কথা বলে যাচ্ছে — নারায়ণ, তুমি আমাকে বাঁচাও। তখন মণিকুন্তলা আমাকে ঘটনাটা বললো। পাশের যে গ্রামে আনন্দময়ী

ছিলো সেই গ্রামেরই একটি বাচ্চা মেয়ে ৭/৮ বছর বয়স -- সে তিনদিন ধরে নিখোঁজ ছিলো। সেই মেয়েটির বাবা, মা এবং পরিবারের অন্যান্যরা আনন্দময়ীর বিশেষ ভক্ত। মেয়েটিও রোজ আনন্দময়ীর জন্য ফুল নিয়ে আসতো আর আনন্দময়ীও মেয়েটিকে খুব ভালোবাসতো। কিন্তু পরশুদিন দুপুরের পর থেকে মেয়েটিকে গ্রামের কোথাও আর পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটির বাবা, মা পাগলের মতো এসে আনন্দময়ীর পায়ে পড়েছে। আনন্দময়ী এই বলে ওদের ভরসা দিয়েছে যে, মেয়েটি ভালো আছে এবং শীঘ্রই ফিরে আসবে। গতকাল রাত্রেও বাচ্চাটির মা বাবা আনন্দময়ীর কাছে এসে কান্নাকাটি করে গেছে, আনন্দময়ী একটাই কথা বলেছে — বাচ্চা ভালো আছে এবং শীঘ্রই ফিরে আসবে। আজ ভোরবেলা গ্রামেরই এক পাশে একটা ভাঙ্গাচোরা বাড়ির কুয়োতে বাচ্চাটির মৃতদেহ ভেসে উঠেছে। ঐ বাড়িতে কেউ থাকতো না। কুয়োর পাশে স্থলপদ্মের একটি গাছ আছে, হয়তো সেই গাছের ফুল পাড়তে গিয়েই মেয়েটি অসাবধানে কুয়োতে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। এই ঘটনায় গ্রামে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং আনন্দময়ী একপ্রকার লুকিয়ে মণিকুন্তলার বাড়িতে এসে উঠেছে। মণিকুন্তলার বাড়িটা আনন্দময়ী চিনতো -- এর আগেও জ্যোতিষের সাথে আনন্দময়ী কয়েকবার এসেছে, তাই চেনা থাকাতে এখানে এসে উঠেছে। মণিকুন্তলা সব কথা শুনে ওকে বলেছে — তোমাকে এই বিপদের হাত থেকে একজনই রক্ষা করতে পারে — তিনি হলেন আমার বালক গোঁসাই, যে আমার ছেলেকে মৃত্যুর থেকে বাঁচিয়েছে। ওদিকে পাশের গ্রামে আনন্দময়ীকে খুঁজে না পেয়ে গ্রামের লোক আরও রেগে গেছে। সবারই এক  কথা — বাচ্চাটা মারা গেছে, আর উনি বলে চলেছেন যে বাচ্চা ভালো আছে, ফিরে আসবে। আমি যখন দাঁতন করতে করতে পায়চারি করছিলাম সেই সময়েই আনন্দময়ী মণিকুন্তলার কাছে এসেছে। মণিকুন্তলা ওর মুখে সব শুনে তাড়াতাড়ি আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। আমি সব শুনে বললাম — মা হয়েছো আর বাচ্চার কান্না শুনতে পাও না? এ কেমন মা তুমি? যাই হোক, পাশের গ্রামে আমারও কয়েকজন ভক্ত ছিলো। আমি সেই গ্রামে আনন্দময়ীকে নিয়ে গিয়ে মেয়ের মা, বাবা আর সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে মিটমাট করে দিলাম। সেদিন গ্রামের সেই সভায় প্রণবেশ ছিলো, ও পুরো ব্যাপারটা চোখের সামনে দেখেছে — সেই ঘটনার কথাই আজকে আলোচনা করছিলো। আমি ওকে বললাম, এটা নিয়ে বাইরে আলোচনা করবে না — কারণ কারুর মান সম্মান নিয়ে আমি কোনো কথা বলি না। আমি হলাম বিশ্বের সুরের পথের পথিক, আমি মানুষের সাথে ছল-চাতুরি করে চমক দিয়ে আমার সম্মান বাড়াই না। আনন্দময়ীকে বলেছিলাম -- তুমি সারাদিন কি করো? খালি পূজা অর্চনা বাসন কোশাকুশি ঘটি বাটি এইসব নিয়েই সারাাদিন চলে যায়? তোমার কোনো তত্ত্ব নেই? একজন সত্যিকারের আধ্যাত্মিক মানুষ এই অনন্ত বিশ্বের তত্ত্বের সাগরে ডুবে থাকে, তার থেকেই খুঁজে পায়

এই বিশ্বের অন্তর্নিহিত সুর। প্রণবেশ বলছে — আপনি সেদিন আনন্দময়ীকে সবার সামনে খুব সম্মান প্রদর্শন করে ওকে রক্ষা করেছিলেন। তাই বলছি সত্যিকারের যে স্বচ্ছ সুর তার থেকে এখানকার সমাজ অনেক দূরে সরে আছে। আনন্দময়ীর এই ঘটনার খবর রামঠাকুরও জানতো। চট্টগ্রামে মেসোমশাইয়ের বাড়িতে রামঠাকুর আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলো। রামঠাকুরের মধ্যে সত্যিকারের স্বচ্ছ সুন্দর সুর দেখেছিলাম। রামঠাকুরকে আমার ভালো লেগেছিলো। এর পরে নারায়ণগঞ্জেও একবার রামঠাকুর দেখা করতে এসেছিলো। তখন ও খুব পেটের অসুখে ভুগছিলো। সেইবার আমাকে জড়িয়ে ধরে ও খুব কেঁদেছিলো। (কালিদাস- এখানকার সাধকদের মধ্যে তোমার আর কাকে কাকে ভালো লেগেছে?) এখানকার সমাজে যাদের খুব নাম তাদের অনেককেই আমি সত্যিকারের সাধক বলে মনে করি না। যারা নিজেদের মান, সম্মান, প্রতিষ্ঠার জন্য — শুধুমাত্র অর্থ রোজগারের জন্য ছল-চাতুরির আশ্রয় নিয়ে শিষ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে তাদের শোষণ করে আমি তাদের সাধকের কোন স্তরেই ফেলতে পারি না। আমি জন্ম থেকে যে সুর নিয়ে এসেছি সেই সুরের সাগরে অহর্নিশ ডুবে থেকে আমার কাজ করে চলেছি, এখানে কোনো ছল চাতুরি দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠার বালাই নেই। তবে কালিদাস যে কথা বললো সত্যিকারের সাধক কি এখানে কেউ নেই? আছে, তা সংখ্যায় খুবই কম। যে দুএকটা আছে তারা আবার এতোটাই আত্মমগ্ন থাকে যে তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টি দিয়ে চেনা কঠিন। আমি কোনো নিন্দা-সমালোচনা করছি না, জিহ্বায় চুল পড়লে যেমন জিহ্বা আপনিই থুঃ করে ফেলে দেয় তেমনি আমার অন্তরের সুরের জিহ্বা দিয়ে যখন দেখতে গেছি তখন যাদেরকে ভালো লেগেছে শুধু তাদের কথাই বলছি। আরও যারা উঁচু স্তরে চলে গেছে তাদের সচরাচর সমাজের বুকে দেখা যায় না। ছোটোকালে যখন হিমালয়ের দিকে যাতায়াত ছিলো তখন ওখানে দেখেছি এখনও কিছু কিছু বড় সাধক সাধনা করে চলেছে। উঁচু-নীচু যে বলছি সেটা তোমাদের বুঝাবার সুবিধার জন্য। আমার দৃষ্টিতে সবাই বিশ্বপ্রকৃতি থেকে একই পুঁজি নিয়ে এসেছে। ধরো দুই ভাই ১০ হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করলো। পাঁচ বছর পর দেখা গেলো এক ভাইয়ের পুঁজি ১০ হাজার থেকে বেড়ে এক লক্ষ টাকা হয়ে গেছে। আরেক ভাই, সেও ১০ হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলো। পাঁচ বছর পরে দেখা গেলো তার পুঁজি তো বাড়েই নি উল্টে তার বাজারে ৫০ হাজার টাকা দেনা হয়েছে। বর্তমানে তোমাদের সাথে বড় বড় সাধকদের তফাত শুধু একটাই যে তাদের পুঁজি বেড়ে গেছে, আর তোমাদের বাজারে দেনা হয়ে গেছে। এই দেনাকে অপরাধের বোঝা বলা হয়। যে সেই পুঁজি এখানে থেকে কাজ করে বাড়িয়ে নিতে যেতে পারে — সেই বড় হয়ে যায়। যেমন শিব বলে যাকে তোমরা জানো, সেও একদিন তোমাদের মতো সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলো। তোমাদের মতো

ঘর-সংসার করেছিলো। তারপর একদিন সেই শিব সাধনার দ্বারা কত বড় হয়ে গেলো। এক স্কুলের সবাই ছাত্র — কেউ ক্লাস ওয়ানে, কেউ টুতে আবার কেউ ক্লাস টেনে পড়ছে। যে আজ ওয়ানে আছে সে যেমন একদিন টেনে উঠবে, সেরকম যে আজকে টেনে উঠেছে সে যে একদিনেই টেনে উঠে গেছে তা নয় — সেও একদিন ক্লাস ওয়ানে ছিলো। তেমনি যাদেরকে আজ বড় বড় সাধক বলছি তারাও একদিন তোমাদের মতো ছিলো। সব জীবই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে আসে। সব জীবই মহাবিশ্বের বীজ। একটা বটগাছের বীজ দেখলে এমনি বুঝা যায় না যে এই বীজ একদিন কতো বড় গাছ হতে পারে। একজন পকেটে করে ৫০০ বটগাছের বীজ নিয়ে চলেছে। কিন্তু সেই একটি বীজ যেদিন পূর্ণ মহিমায় ফুটে বের হবে তখন সেই ব্যক্তির মতো কয়েকশো ব্যক্তি সেই বটগাছের তলায় আশ্রয় নিতে পারবে। সৃষ্টির কার্য্যাবলীতেও ঠিক সেরকম বীজ ফুটিয়ে তোলার মতো ব্যবস্থা হয়ে চলেছে। এখানে তোমাকে অল্প মাত্রায় বিশ্বের সবকিছুর sample দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যে দেখতে পারো, শুনতে পারো, স্বাদ স্বোয়াদের ব্যবস্থা, রাগ করো, মেজাজ করো, হিংসা করো, অভিমান করো — এই সবকিছু হলো বিশ্ব থেকে sample হিসেবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতি দেখবে তুমি কতোটা প্রকৃতির নিয়মের সাথে হাত মিলিয়ে এই sample গুলো ব্যবহার করছো। সাধারণ যারা তারা এই sample-এর প্যাঁচে পড়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। সামান্য লোভে, সামান্য মোহে, সামান্য অর্থের জন্য, সামান্য যশের জন্য এহেন অন্যায় নেই যা করতে পিছপা হচ্ছে না। প্রকৃতি কিন্তু দৃষ্টান্ত দিয়েছে মৃত্যু — যাতে তুমি সর্তক থাকো যে এখানকার খেলা সামান্য কয়েক দিনের। তোমাদের মতো সাধারণ মানুষ যারা, তারা এর বেশী ভাবতে পারে না — এর প্রভাবে পড়েই সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়। এর ফলে হয় কি খুব সামান্য কারণে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। এই বলু বিশুদের কতো ভালোবেসেছি, সেই ঢাকা থেকে ওদের সাথে আমার পরিচয়। কিন্তু দেখো অতি সামান্য কারণে তারা আমার থেকে সরে গেলো। এইটা হচ্ছে এখানকার সাধারণ মানুষের স্তর। এটা হলো অজ্ঞানতার স্তর। তাই যারা বড় বড় হয়ে গেছে তারা সাধারণ মানুষের নিন্দা বা প্রশংসা — কোনোটাকেই গ্রাহ্য করে না। কারণ যারা নিজেরাই অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছে তারা অন্যের বিচার কি করবে? ধরো তুমি একটা খুব সুন্দর হীরার নেকলেস পরেছো। এখন কোনো অন্ধ ব্যক্তি যে কিছুই দেখতে পায় না সে যদি তোমার নেকলেসের প্রশংসা করে তোমার কি শুনতে ভালো লাগবে? কারণ, যে বিন্দুমাত্র দেখতে পায় না সে একটা দৃশ্য বস্তুর সৌন্দর্য্য কিভাবে উপলব্ধি করবে? ঠিক সেরকম বড় বড় যারা হয়ে গেছে তারাও তোমাদের মুখে তাদের প্রশংসা বা নিন্দা কোনোটাকেই বিশেষ গুরুত্ব দেয় না — শুধু শুনে যায় আর তোমাদের সাথে তাল দিয়ে যায়। এই স্তর হলো সাধারণ মানুষের স্তর — যাদের মনে বিশ্বপ্রকৃতির

অপার রহস্য সচরাচর কোনো প্রভাব ফেলে না। এর উপরে একটা স্তর আছে, যে স্তরের ব্যক্তিরা এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে একটা রহস্যের আভাস খুঁজে পেয়েছে — তারা হন্যে হয়ে পথ খুঁজছে, কিন্তু পথ পাচ্ছে না। এরা সংখ্যায় খুবই কম। তার অনেকটা উপরে আমি যাদের সাধক বলি তাদের স্থান। সাধক কারা? যারা সাধনা করে। সাধনা কারা করে? যারা পথ পেয়ে গেছে। সাধারণতঃ মণিপুরে আসলে এই পথচলা শুরু হয়। এখানেও দেখো, তোমরা যখন মায়ের পেটে ছিলে তখনই মণিপুরেই অর্থাৎ নাভির থেকেই খাদ্য টেনে নিয়েছো। সেই বড় বড় সাধক, যারা মণিপুর অতিক্রম করেছে তাদের একটাই কাজ — বিশ্বের সেই সুরের ইঙ্গিত ধরে ধরে এগিয়ে চলা। এই শ্রেণীর সাধক এখানকার সমাজের বুকে দেখা যায় না, তবে পাহাড়ের দিকে এখনও কিছু কিছু আছে। (কালিদাস- তুমি যে কলমের গাছ নিয়ে কয়েকদিন ধরে আলোচনা করছো সে কি এই স্তরের?) না, আমার কলমের গাছ যে হবে সে শুধু সাধকদের কেন আরও উপরে যারা চলে গেছে তাদেরও উপরে অবস্থান করবে। সাধকদেরও অনেক স্তর আছে, খুব যারা উঁচুতে চলে গেছে তারাই একদিন দেবতা হয়ে যায়। ছোটোবেলায় আমার সাথে খুব উঁচু সাধকদের বেশ কয়েকটা দল মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতো। দোগাছির বাড়িতে একবার পাঁচজন সাধকের এরকম একটা দল রাত্রিবেলা দেখা করতে এসেছিলো। তারা বিশাল বিশাল পুরুষ। আমি যে ঘরে ছিলাম সে ঘরে ওদের কথার আওয়াজ শুনে দিদিমা পাশের ঘর থেকে দেখতে এসেছিলো। এসে তো একেবারে অবাক হয়ে গেছে -- এরকম বিশাল বিশাল চেহারার মানুষ তো দেখেনি! এরা আকাশপথে ভ্রমণ করতে করতে আমার সন্ধান পেয়ে দেখা করতে এসেছিলো। এরকম আরেকটা গ্রুপ মাঝে মাঝে উজানচরে রাতের দিকে আসতো। একবার আমার বোন গীতা ওদের দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, গীতা তখন ৫/৬ বছর হবে — ও শুয়ে ছিলো। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে ওদের দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠেছিলো। এই দলটা পাহাড়ের একটা স্থানে এখনও অবস্থান করছে। ওরা আকাশপথে মাঝে মাঝে সাগরের দিকে যায়, তখন আমার সাথে দেখা করতে চায়। এই দলটিও বসে আছে কলমের গাছের জন্য। শুধু সাধকদেরই না, আরও অনেক উঁচুতে যারা আছে তাদেরও কলমের গাছ guide করতে পারবে। ছাত্রদেরকে যে মাস্টার পড়ায়, আর সেই মাস্টারকে যে পড়ায় তাকেও মাস্টারই বলা হয় — তবুও সাধারণ মাস্টারের সাথে তার কোনো তুলনাই চলে না। কলমের গাছ হলো গিয়ে মাস্টারদের মাস্টার। (কালিদাস- যারা পথ পেয়ে গেছে তাদের আবার guide করার প্রয়োজন কি?) বিশ্বের এই পথ অনন্ত পথ — এই পথ অনন্ত কালের। পথে চলতে চলতে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন পথিক হতে পারে। কলমের গাছ সেই অসুবিধা থেকে তাদেরকে মুক্ত করে দেবে। তাছাড়াও দেখা যায় অনেক সুগম পথ আছে, সেই পথের সন্ধান জানা নেই বলে অনেকে একটু

কঠিন পথ দিয়ে যাত্রা করছে। সেই সুগম পথের সন্ধান কলমের গাছ সেই সাধকদের দিয়ে দেবে। অনেক পরিশ্রম করে যে পথ অতিক্রম করা হয়, পরে দেখা যায় সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে আরও সহজ পথ ছিলো। পাহাড়ের রাস্তায় দেখেছো ঘুরে ঘুরে উপরে ওঠে। এই ঘোরাপথে দেখা গেলো কয়েক মাইল চললো কিন্তু সত্যিকারের উঠলো হয়তো ১০০ বা ২০০ মিটার। পাহাড়িয়া রাস্তায় এইভাবেই তো সবাই ওঠে। কিন্তু হেলিকপ্টারে যদি কেউ যায় সে কিন্তু সোজা লম্বালম্বি উঠবে, তাকে তো পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে উঠতে হবে না! ফলে সেই ব্যক্তি খুব অল্প সময়ে এবং কম পরিশ্রমে অনেক উচ্চতায় খুব সহজে চলে যাবে। এখানকার যারা যোগীরা, তারা বড় বড় হয়ে গেলেও বেশীরভাগই খুব কঠিন পথ ধরে তাদের রাস্তা অতিক্রম করেছে। তারা তাদের সংস্কারের প্রভাবে পড়ে অনেক সহজ জিনিষকে জটিল করেছে। অন্যদিকে আমার পথ হলো প্রকৃতির যে সহজাত ধারা, যে original instinct-সেই পথই আমার পথ। আমার কলমের গাছ যেহেতু আমার সহজাত চেতনাতেই বড় হবে তাই সে তখন প্রকৃতির সেই সংস্কারমুক্ত অতি সহজ পথের বার্তা যোগীদের জানিয়ে দিতে পারবে। এর ফলে যে কাজ করতে তাদের হয়তো কয়েক হাজার জন্ম লাগতো সেই কাজ ওরা এক জন্মেই সেরে ফেলতে পারবে। তার জন্য ওরা কলমের গাছের আশায় আকুল ব্যাকুল ভাবে বসে আছে আর আমার কাছে দিবারাত্র প্রার্থনা জানাচ্ছে কবে আমি কলমের গাছ করে কাউকে পাঠাবো! প্রকৃতি থেকে আমার যে records, সেই চার আনার আইনের জন্য ওদের পক্ষে তো আমার কাছে আসা সম্ভব হচ্ছে না। চার রাস্তার মোড়ে যেমন arrow থাকে — এদিকে G.T. Road, ওদিকে B.T. Road ঠিক সেরকম প্রকৃতি থেকেই যেন সাধকদের দিকনির্দেশ করার জন্য কলমের গাছ আসবে। বিরাট বিরাট সাধক, যারা দেবতুল্য হয়ে গেছে তারা ওকে মাথায় করে রাখবে কারণ স্রষ্টার নির্দেশ যেন ওর মাধ্যমেই সাধকদের কাছে আসবে। তারা তাদের এতোদিনকার সব সাধনা ফেলে তার নির্দেশেই পথ চলবে। এছাড়াও একটা বড় ভূমিকা কলমের গাছের থাকবে, আইনের প্যাঁচে পড়ে যে সমস্ত বড় সাধকদের সাথে বা অন্য যে কোনো কারণে যাদের সঙ্গে আমার দেখা হলো না কলমের গাছ ইচ্ছা করলে তাদেরকে আমার কাছে অতি সহজেই নিয়ে আসতে পারবে। প্রকৃতি থেকে সাধকদের কাজ সহজ করার জন্যই কলমের গাছের সৃষ্টি কারণ আমি বিশ্বের অনেক আইনের মধ্যে দিয়ে চলছি, কিন্তু ওর উপর আইনের খবরদারি থাকবে না। পাহাড়ে সাধকদের মধ্যে মাঝে মাঝে সভা হয়, ১২ বছর পর পর বিরাট সভা হয়। সেই সভায় সাধকদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়। সাধনার পথ আরও সহজে আরও কম সময়ে বেশী পথ কিভাবে অতিক্রম করা যায় সেইসব নিয়ে আলোচনা হয়। কারণ সময় খুব সংকীর্ণ, দেহ নিয়ে থাকতে থাকতে যেটুকু কাজ করা যাবে সেটাই থাকবে — বিদেহী হয়ে কাজের ফল হয় না। তাই জন্ম থেকে মৃত্যু

এই সামান্য সময়ের মধ্যে যতটা কাজ করে রাখা যায়, সেটাই চিরকালের জন্য থেকে যায়। যেহেতু তারা প্রকৃতির কাজে ব্যস্ত থাকে তাই প্রকৃতি অবশ্য তাদেরকে একটু সুবিধা দেয় যে তাদের আয়ু কয়েকশো বছরও অনেক সময় হয়। কিন্তু যতোই আয়ু থাকুক না কেন মৃত্যুর হাত থেকে তো রেহাই পাবে না, সাধনার তুলনায় এই আয়ু খুবই সামান্য — তাই কতো কম সময়ে কতো বেশী করা যায় এই চিন্তা নিয়েও আলোচনা হয়। ১৯৩৭ বা ১৯৩৮ সালে এইরকম এক সভায় আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলো। সেইবার ভূপেন আমার সাথে পাহাড়ে গিয়েছিলো। (কালিদাস- বঙ্কা বলেছে ১৯৩৮ সাল) হ্যাঁ, ও গেছিলো — ১৯৩৮ সালই হবে — সেটা ঐ ১২ বছর পর পর যে বড় সভা হয় সেরকম একটা সভা। এমনিতে মাঝে মাঝেই সভা হয় কিন্তু ১২ বছর পরে পরে যেটা হয় — সেটা বিশেষ সভা। ভূপেন আমার সাথে রংটং না রংসেটাং এরকম কি একটা জায়গা পর্য্যন্ত গিয়েছিলো, তারপর সেখান থেকে আমাকে ওরা একা নিয়ে গিয়েছিলো। ভূপেন ঐ জায়গা থেকে ফিরে এসেছিলো। ওখানে বাইরের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। কিন্তু আগের ক্লাসে যে বলেছিলাম যে চার আনার সেই আইনের জন্য খুব যারা বড় বড় হয়ে গেছে — তারা আমার কাছে আসতে পারেনি। তাদের বার্তা আমার কাছে অন্যান্যরা বয়ে নিয়ে এসেছিলো। আমি যাতে কাউকে তাদের কাছে পাঠাই সেই অনুরোধ তারা জানিয়েছিলো। আমি তখন বলেছিলাম আমার কোনো সন্তানকে আমি আমার প্রতিনিধি করে পাঠাবো। সেই সাধকদের জন্য আমার সেই সন্তান, সেই কলমের গাছ যাবে। সাধকদের সেই সভায় যে সবচেয়ে বড় হয়ে গেছে, তাকে বিচারকের আসনে বসানো হয়। কিন্তু ৩৮ সালের পর থেকে এখন পর্য্যন্ত যতো বার সেই সভা হয়েছে সেই বিচারকের আসন ফাঁকা রাখা হয়েছে। এখনও সভা হয়, ভাবের আদান-প্রদান হয় তবে বিচারকের আসনটা ফাঁকা রাখা হয়। একটা শুধু ফুলের মালা সর্বোচ্চ আসনটাতে রেখে ওরা ওদের আলাপ আলোচনা করে। আমি যতোদিন না কাউকে পাঠাচ্ছি ততোদিন ঐ আসন তারা ফাঁকাই রাখবে। (কালিদাস- এই সভা কি এখনও হয়?) বহু বছর ধরে এটা চলে আসছে। ১৯৩৮-এর সাথে ১২ যোগ করো — কতো হয় -- ১৯৫০ — হ্যাঁ, ১৯৫০-এ হয়েছে, তারপর আরও ১২ যোগ করো — কতো হয় ১৯৬২ সাল, ১৯৬২-তেও হয়েছে — এইভাবে প্রতি ১২ বছরে একবার করে হয়। (কালিদাস- এরপরে তাহলে ৭৪ সালে হবে, তারপরে ৮৬, ৯৮ এরকম চলতে থাকবে। সেদিন যে শিবের সাধনার আসনের কথা বলছিলে সেই আসন আর এই বিচারকের আসন দুটো কি এক?) না, শিবের যে সাধনার আসন সেটা পাহাড়েরই অন্য একটা জায়গায়। সেই জায়গা বড় বড় সাপেরা পাহারা দিচ্ছে। তার কাছাকাছি এখনও কিছু খুব বড় যোগী কাজ করে চলেছে। অনেকে এমনও আছে যে গাছের তলায় বসে একটানা সাধনা করতে করতে গাছের অংশ পাতা ডাল আস্তে আস্তে

ওর উপর grow করেছে, এমন চেহারা হয়েছে যে ভালো করে লক্ষ্য না করলে গাছ না মানুষ বোঝাই যায় না। আর এই বিচারকের আসনের কথা যে বললাম সেটা হলো ১২ বছর পর পর যখন সভা হয়, সেখানে খুব বড় বড় যোগী ও সাধকেরা একত্রিত হয় — সেখানে সব থেকে বড় যে তাকে বিচারক করা হয় — সাধনার কোনো কিছু নিয়ে দ্বিমত হলে তিনি রায় দেন এবং তার রায় সকলেই মেনে নেয়। ৩৮ সাল থেকে প্রতি ১২ বছর অন্তর সেই বিচারকের আসনে একটা মালা রেখে তারা সভা করে চলেছে, কাউকে আর বিচারক করেনি। আমার representative করে কাউকে যদি আমি কোনোদিন পাঠাই তবেই তাকে ওরা সেই আসনে বসাবে। (কালিদাস- শিবের আসন আর বিচারকের আসনে কি একই লোক বসবে না কি আলাদা আলাদা করে দুজন যাবে?) কাউকে যদি কোনো কাজ দিয়ে কোনো গ্রামে পাঠানো হয়, সেই গ্রামেই যদি অন্য কোনো কাজ থাকে তাহলে কি তার জন্য আলাদা ভাড়া খরচা করে আরেকজনকে পাঠানো হয়? সহজ যুক্তি কি বলে? পাহাড়ে একজনই যাবে, সে আমার প্রতিনিধি হয়েই যাবে। এখন কলমের গাছ যদি তার খুশিতে কাউকে সাথী করে নিয়ে যায় সেটা অন্য কথা। প্রকৃতির আপন নিয়মেই হঠাৎ হঠাৎ কারুর মধ্যে বিশ্বের সুর খুব সহজে ধরা পড়ে, তখন Universe থেকে তাদের খুব বড় status দেওয়া হয়। কলমের গাছও সেরকম খুব বড় status-এর অধিকারী হবে। বড় বড় যোগীরা তাকে ঈশ্বরের মতো দেখবে। আমি যেমন এই বিশ্বকে represent করছি ঠিক সেরকম আমার কলমের গাছও আমার representative হয়ে তাদের কাছে যাবে। আমার ইচ্ছাটাই ওর মধ্যে reflected হবে। বনের মধ্যে হাজার হাজার গাছ পড়ে আছে, তার মধ্যে হঠাৎ কোনো একটা গাছে বিশেষ একটা ফুলের জন্ম হয় — সেই ফুলগাছ তখন সকলকে মুগ্ধ করে, আকর্ষণ করে নিজের দিকে টেনে আনে। কয়লার খনিতেও অনেক সময় দেখা যায় এমন একটা বড় হীরার জন্ম হয়েছে যার দাম এতো বেশী হলো যে সেই হীরার খণ্ডটা দিয়ে ঐ কয়লা খনিটাই কিনে নেওয়া যাবে। কয়লা আর হীরা তো একই বিষয়বস্তু দিয়ে তৈরী — কিন্তু দুটোর দামের কতো পার্থক্য! এই যে মণ্ডলরা — যাদের কয়লার খনি ছিলো — ওরা তো আমাকে নিয়ে গেছে কয়েকবার ওদের ওখানে — ওরাই আলোচনা করেছে যে ওদের পরিচিত কার কয়লাখনিতে যেন এরকম ঘটনা ঘটেছিলো — এমন একটা হীরার জন্ম হয়েছে সেই হীরা দেখতে বিদেশ থেকে সাহেবরা এসেছিলো। কলমের গাছও ঠিক সেরকম ভাবে এখানকার পরিবেশে জন্ম নিয়েও যেন অন্য একটা সময়ের থেকে আসবে। তোমাদের তুলনায় সে অনেকটাই এগিয়ে থাকবে এবং তোমাদের সাধারণ বিচারে ওর দাম পরিমাপ করা যাবে না। প্রকৃতি থেকে যাকে পাঠাবে কলমের গাছের জন্য — তাকে আমি আমার মনের মতো করে তৈরী করবো, এখানকার পরিবেশের প্রভাব যাতে না পড়ে তাই একটু আড়াল করে ওকে রাখতে হবে।

কতোটা করে উঠতে পারবো জানি না, তবে সাধক আর যোগীদের একান্ত ইচ্ছাতেই কলমের গাছ রূপ নেবে। আমার সত্যিকারের রূপটা, আমার আসল চিন্তাটা ওর থেকেই সবাই জানতে পারবে। আমি তো দেখো, সেই শিশু বয়স থেকে আমার সুরের বাইরে অন্য কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করি নি। এতো নিন্দা বদনাম সব হজম করে এগিয়ে চলেছি, কোনোদিন এক মুহূর্তের জন্যও আমি আমার ক্ষমতার অপব্যবহার করিনি — তাই বিশ্বপ্রকৃতিতে আমার records এতো ভালো হয়েছে। এই কথা আমার ব্যক্তিগত কথা — তোমাদের জানানোর উদ্দেশ্য নিয়ে বলছি না, কাছে আছো তাই আমার মুখে এই কথা শুনতে পেলে। Universe-এ আমার কি position সেটা ঐ পাহাড়ের সাধকরা কিছুটা উপলব্ধি করেছে। কিন্তু তারা আমার কাছে পৌঁছাতে পারছে না। কলমের গাছ ইচ্ছা করলে সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। এতো বড় একটা সাগরকে একজন সামান্য ব্যক্তিই তো খাল কেটে বহু দূরে পৌঁছে দিতে পারে। এইভাবে খাল কেটে কেটে সাগরের জল বইয়ে দিয়ে মরুভূমিকেও সবুজ করে দেওয়া যায় যদি সেরকম অধ্যবসায় থাকে। তোমরা যদি আমাকে বুঝতে পারতে তাহলে তোমাদের জীবন অন্যরকম হয়ে যেতো। মেঘ যেমন সূর্য্যকে আড়াল করে রাখে, তোমাদের হাজার হাজার জন্মের অপরাধের বোঝাও ঠিক সেরকম তোমাদেরকে আমার থেকে আড়াল করে দিচ্ছে — তোমরা আমাকে বুঝে উঠতে পারছো না — অতি সামান্য জাগতিক চাওয়া পাওয়ার মধ্যে আমাকে রেখে সেইসব কাজ আমাকে দিয়ে করাতে চাচ্ছো। আমি তোমাদের মনের মতো না চললেই বিরূপ হয়ে চলে যাচ্ছো, আবার বলু বিশুর মতো কেউ কেউ আমার বিরুদ্ধে কোর্টে যাবারও plan করছে। আমি সব বুঝেও চুপ করে থাকি। তোমরা যদি একটু আমার মনের মতো চলতে তাহলে আমি তোমাদের এই বিশ্বের খনি থেকে অনন্ত সম্পদ তুলে তোমাদের ভরপুর করে দিতে পারতাম। তোমরা তখন বুঝতে পারতে যা পেলে সব পাওয়া হয়ে যায় সেই সম্পদ একমাত্র আমি তোমাদের দিতে পারি এবং তার জন্য তোমাদের কোনো সাধনাও করতে হবে না — শুধুমাত্র আমার খুশির দ্বারাই আমি তোমাদের তা দিতে পারি। তোমরা সেই পরম সম্পদের খোঁজ না করে সামান্য সামান্য জাগতিক বিষয়বস্তু যা চিরকাল তোমার সাথে থাকবে না তাদের মোহে পড়ে ডুবে যাচ্ছো। আমি চাই তোমরা আমাকে একটু কাজে লাগাও।

রাম নারায়ণ রাম

## 155, Park Street
## 22-9-1967

(আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করবার জন্য বেনারস থেকে তিনজন সন্ন্যাসী এসেছিলো। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের সাথে দেখা করেন এবং খেয়ে যাওয়ার কথা বলেন। এরা চলে যাওয়ার পর দুপুরবেলা শ্রীশ্রীঠাকুর এই আলাপ করেন।)

শ্রীশ্রীঠাকুর- ওরা কি চলে গেছে?

কালিদাস- হ্যাঁ, একটু আগে বেরিয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর- যাওয়ার আগে ওদের হাতে কিছু পয়সা দিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলাম।

কালিদাস- হ্যাঁ, প্রিয়প্রসাদ দিয়েছে। আজ যারা এসেছিলো ওরা কি আগে তোমাকে কোথাও দেখেছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর- ওদের সাথে একজন সাধকের দেখা হয়েছিলো। আমার যখন ১৬/১৭ বছর বয়স তখন একবার পাহাড়ের দিকে যাওয়ার সময় কালিম্পং-এ আমার সাথে সেই সাধকের দেখা হয়েছিলো। ঐ সাধকের কাছ থেকেই ওরা আমার কথা শুনে থাকবে।

কালিদাস- ওরা কি খুব বড় সাধক?

শ্রীশ্রীঠাকুর- সবাই বড় সাধক। যে কাজ করবে সেই বড়, এখানে ছোটো বা বড়র প্রশ্ন আসছে কেন?

কালিদাস- ওরা তোমাকে রামকৃষ্ণ নিয়ে কি যেন জিজ্ঞাসা করছিলো?

শ্রীশ্রীঠাকুর- ওদের মধ্যে একজন এক সময় ঢাকায় ছিলো। তাও প্রায় ২০- ২৫ বছর আগে। ঐ সময় রামকৃষ্ণ মিশনে যাতায়াত করতো। ও জানতে চাইছিলো রামকৃষ্ণ সম্পর্কে। আমি বললাম আমাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করাই ভালো।

কালিদাস- তুমি কি ওদের রামকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছুই বলোনি?

শ্রীশ্রীঠাকুর- আমি সচরাচর কোনো ব্যক্তির বিষয়ে মন্তব্য করা পছন্দ করি না। তবে সত্যকে জানার আকুলতা থেকে স্বচ্ছ মন নিয়ে কেউ কিছু প্রশ্ন করলে তখন হয়তো ২/১টা কথা কোনো কোনো সময় বলে থাকি। আমার অন্তরের সুরের যন্ত্রে যা ধরা পড়ে সেটাই আমি নিরপেক্ষভাবে বলি। কোনো ব্যক্তি যদি রোগা হয় তখন তাকে রোগা বলা হয়, কারুর গায়ের রং কালো হলে তাকে যেরকম কালো বলা হয় — ঠিক সেরকম আমার অন্তরচক্ষুতে যেটা ভেসে ওঠে সেটাই আমি বলি। কিন্তু সমস্যা হলো তোমরা যেমন তোমাদের এখানকার চক্ষু দিয়ে রোগা বা কালোটা দেখতে পাচ্ছো ঠিক সেরকম স্পষ্টভাবে তো কারুর আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বুঝতে পারছো না! তাই তখন কেউ যদি আমার উপর নির্ভর করে দুটো কথা সরল মনে জিজ্ঞাসা করে তখন ২/১টা কথা বলে থাকি। এখানকার

আধ্যাত্মিকতার বেশীরভাগটাই দাঁড়িয়ে আছে প্রচারের উপর। যার যতো প্রচার, সে এখানে ততো উঁচু অবতার। গভীর ভাবে তলিয়ে তো সবাই দেখতে পারে না। তাই সেই মনের সাড়া না পেলে হালকা প্রশ্নের অনেক সময় উত্তর এড়িয়ে যেতে হয়। স্বচ্ছ মন নিয়ে কোনো কথা গ্রহণ না করলে অনেক সময় আমার কথার অপব্যাখ্যা হয়। আবার যাকে বললাম সে হয়তো জানার আগ্রহে স্বচ্ছ মনেই সেটাকে গ্রহণ করলো, কিন্তু সে আবার অন্য কাউকে বললো এবং যাকে বলা হলো সে হয়তো কথাটার সারমর্ম বুঝে উঠতে পারলো না। তাই রবিবারের ক্লাসে সচরাচর আমি তত্ত্বের কথাই বলি, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি।

কালিদাস- ত্রৈলঙ্গ স্বামী আর লোকনাথ ব্রহ্মচারী সম্পর্কে ওদের কি যেন বলছিলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর- ত্রৈলঙ্গ আর লোকনাথকে আমি খুব ভালোবাসি। এরা খুব উঁচুদরের সাধক। অশ্বিনী চ্যাটার্জ্জীকে লোকনাথ একবার বেনারসে পাঠিয়েছিলো ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাছে। অশ্বিনী তখন ত্রৈলঙ্গ স্বামীর জন্য প্রায় দেড় মন দুধ দিয়ে পায়েস রান্না করেছিলো। অশ্বিনী খুব ভালো রান্না করতে জানতো। আজকে যারা এসেছিলো ওরা তো বেনারস থেকে এসেছে, তাই সেই পায়েস রান্নার গল্প বলছিলাম। অশ্বিনী একবার আমার জন্য মুন্সীগঞ্জ থেকে রান্না করে নিয়ে এসেছিলো। ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে পায়েস রান্না করে খাওয়ানোর ঘটনাটা ও প্রায়ই বলতো। অশ্বিনী যখন ঢাকাতে আমার কাছে আসতো তখন তো আমার বয়স ১৬/১৭ বছর। ওর সাথে চিন্তাহরণ মাস্টার নামে একজন আসতো। আমার মা ওদের দুজনকে খুব ভালোবাসতো। এখনও মা মাঝে মাঝে ওদের কথা বলে। সাধক হিসেবে মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এইসব এলাকায় অশ্বিনীর খুব নামডাক ছিলো। বিবেকানন্দ যখন পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলো তখন অশ্বিনীর সাথে দেখা করে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করেছিলো। অশ্বিনী বলেছিলো যে, আমি লোকনাথ বাবার দেওয়া অর্দ্ধমন্ত্র পূর্ণ করে দেওয়ার জন্য সেই পূর্ণব্রহ্মের প্রতীক্ষা করছি — আমার পক্ষে তোমার মিশনে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। লোকনাথ ব্রহ্মচারী অশ্বিনীকে অর্দ্ধমন্ত্র দিয়ে বলেছিলো যে একজন পূর্ণব্রহ্ম মহাপুরুষ আসবে এবং সে এই অর্দ্ধমন্ত্রকে পূর্ণ করে দেবে। এরপর তো তোমরা জানো ঘটনাচক্রে মুন্সীগঞ্জে ঝড়ের রাত্রে আমার সাথে অশ্বিনীর দেখা হয়েছিলো।

কালিদাস- ওরা তোমার বলা কলমের গাছ সম্পর্কে কি যেন জিজ্ঞাসা করছিলো?

শ্রীশ্রীঠাকুর- সেই সাধক যার সাথে আমার কালিম্পং-এ দেখা হয়েছিলো পাহাড়ে যাওয়ার সময় সেই ছোটো বয়সে ওর থেকেই এই তিনজন কলমের গাছের খবর পেয়েছে। পাহাড়ের যারা বড় বড় সাধক তারা তো আমাকে বুঝে ফেলেছে, কিন্তু আইনের প্যাঁচে পড়ে আমার কাছে আসতে পারছে না। তাই ওরা তীব্র আকুলতা নিয়ে কলমের গাছের অপেক্ষাতেই পথ চেয়ে আছে। কিছুদিন হলো আমার বুকেও তাদের আকুলতা

ব্যাকুলতা এসে বাড়ি খাচ্ছে। সেটাই ওদের জানালাম। রাত্রিবেলা যখন কাজে বসি তখন সেই চিৎকার, সেই আর্তি সমুদ্রের ঢেউ যেভাবে পাড়ে এসে লাগে ঠিক সেরকম আমার বুকে এসে ওদের কান্না বাড়ি খাচ্ছে। আমি তো প্রকৃতির উপরেই সবটা ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি থেকে কাউকে পাঠালে তবেই আমি বলতে পারবো। তবে কিছু কিছু পূর্বাভাস আসছে, তাতে আসবার একটা আভাস পাচ্ছি। আমি নিজের ইচ্ছায় যে কিছু করছি তা নয়, প্রকৃতির কাজের সুবিধার জন্য যা হওয়ার তা হয়ে চলেছে। এই কলমের গাছ তৈরী করার যে ইচ্ছা সেটা আজকের নয়। যেবার পাহাড়ের সম্মেলনে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো সেই সময় বা তারও আগে থেকে প্রকৃতির মধ্যে একটা আলোড়ন চলেছে। কারণ কলমের গাছের যে stage তা সাধারণ চিন্তাতে কল্পনাও করা যাবে না। আমি যদি কলমের গাছ রূপে কাউকে তৈরী করবো বলে মনে মনে ঠিক করি তাহলে আমার এই চিন্তার সাথে সাথে সে এমন একটা stage পাবে যা সাধারণ ভাবনা দিয়ে বিচার করা যাবে না। এককথায় এইটুকু শুধু বলতে পারি যে এই পৃথিবীর বুকে যে পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক ভাবে যাওয়া সম্ভব আমার কলমের গাছ শুরুই করবে তার উপর থেকে। ফলে এখানকার যে কোনো সাধকই হোক না কেন, এমনকি যারা দেবতা status পেয়ে গেছে এখানে সাধনা করে তারাও ওর পায়ে এসে পড়বে কারণ ওর status-টাই হবে সেরকম। যে কাজ করতে অনেক দিন লাগে আমি অতি সহজে ওর জন্য সেসব করে রাখবো।

কালিদাস- তুমি তো আমাদের সবার জন্যই কাজ করে চলেছো, তবে কলমের গাছের ক্ষেত্রে যে কাজ করবে আর আমাদের ক্ষেত্রে যে কাজ করছো — এই দুটো কাজের তফাৎটা যদি একটু বুঝিয়ে বলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর- তোমাদের জন্য যে কাজ করছি সেটা হলো কিভাবে তোমাদের হাজার হাজার জন্মের অপরাধের বোঝা পরিষ্কার করে তোমাদের একটা জায়গায় reach করিয়ে দেওয়া যায়। এই কাজের দায়িত্ব কেউ নেবে না — আমি বলেই তোমাদের জন্য এই হরিজনের কাজ, নোংরা পরিষ্কারের কাজ করে চলেছি তোমাদের শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে। এই কাজ করতে আমি বাধ্য নই, কিন্তু আমার মায়াতে আমি এই কাজ করছি। এটা আমার কাজ নয়। আমি যে কাজের জন্য এসেছি সেই কাজ শেষ করে যাওয়ার সময় যদি চাই আমার গাড়িতে তোমাদের মতো হাজার হাজার বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারবো। এটা পুরোটাই আমার ব্যক্তিগত খুশির উপর নির্ভর করবে। আর প্রকৃতি থেকে যে কলমের গাছকে পাঠাবে, সেখানেও আমার খুশিই কাজ করবে — কিন্তু তার কাজটা একটু অন্যরকম ভাবে হবে। ছোটোবেলায় একবার মনে আছে — আমি তখন উজানচর কৃষ্ণনগরে ছিলাম। আমার তখন ৮/৯ বছর বয়স হবে। আমি একটা বেড়ার ঘর তৈরী করে সেখানে রাত্রে কাজে বসতাম। ঐ ঘরে রাত্রে মনাই ফকির আসতো, আরও অনেকে

আসতো। একদিন রাত্রে খুব ঝড় হয়েছে। ঝড় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মনাই ফকির বাইরে বেরিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি একটা চড়াই পাখি আর সেই পাখির তিনটা খুব ছোটো ছোটো বাচ্চা নিয়ে মনাই ফকির আমার পায়ের কাছে এনে রাখলো। আমার ঘরের পাশে একটা গাছের নীচে ওদের পড়ে থাকতে দেখে মনাই ফকির হাতে করে নিয়ে এসেছে। আমি দেখলাম যে মা চড়াই পাখিটার অবস্থা খুবই খারাপ, হয়তো ঝড় থেকে বাচ্চাগুলোকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেই প্রায় মরণাপন্ন। বাচ্চাগুলোর সেদিক থেকে তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম মা চড়াই পাখিটা মারা গেলো। মারা যাওয়ার আগে আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছিলো যেন আমাকে বলছে — তুমি ওদের দেখো। আমি তো ভাবছি কি করবো। আমার তখন দুর্দান্ত কাজের period চলছে — এখন এই বাচ্চা তিনটাকে দেখাশোনা করতে হলে আমার অন্যান্য কাজ করা একটু কঠিন হয়ে পড়বে। তাই একটু ভেবে নিয়ে মনাই ফকিরকে ঘটিতে করে একটু জল নিয়ে আসতে বললাম। পাশেই তিতাস নদী, ফকির দৌড়ে গিয়ে ঘটিতে জল নিয়ে এনে আমাকে দিলো। আমি করলাম কি — একটা করে পাখির বাচ্চা হাতে নিয়ে একটু একটু করে জল ছিটিয়ে দিচ্ছি ওদের গায়ে আর ওরা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে ৩/৪ মিনিটের মধ্যে তিনটা পাখিই বড় হয়ে গেলো। মনাই ফকির তো অবাক চোখে দেখছে! দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনটা পাখি কয়েক মিনিট আগেও একেবারে শিশু ছিলো, এখন একেবারে স্বাভাবিক চড়াই পাখি যেমন হয় সেরকম হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে যাদের পাখাই ঠিক মতো গঠন হয়নি, তারা এখন সুন্দর পাখা নিয়ে আমার ঘরের এখান থেকে ওখানে উড়ে বেড়াচ্ছে। আমি মনাই ফকিরকে বললাম — সকাল হলে ওরা আপনিই উড়ে চলে যাবে, আর ওদের নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। সেই রাতটা ওরা আমার ঐ বেড়ার ঘরেই কাটালো আর সকালবেলা মনাই ফকির যখন বের হয়েছে তখন ফকিরের সাথে সাথে ওরাও বাইরে উড়ে গেলো। তাহলে এটাই দেখা যাচ্ছে, যে stage-এ পৌঁছাতে অনেক সময় লাগে ইচ্ছা করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়। চড়াই পাখিরা যে বড় অবস্থায় উড়ে গেলো স্বাভাবিক নিয়মে সেই জায়গায় পৌঁছাতে ওদের হয়তো আরও কয়েক মাস লাগতো, আমি কয়েক মাসের কাজটা তিন মিনিটের মধ্যে করে দিলাম। আজ বেশ কিছুদিন হলো বিশ্বপ্রকৃতিও যেন সেই চড়াই পাখির মায়ের মতো আমার দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে আছে আর বলতে চাইছে — প্রকৃতি প্রেরিত কাউকে আমি যেন আমার মতো করে তৈরী করি। তাই কেউ যদি সত্যি এসে উপস্থিত হয় প্রকৃতির থেকে তাহলে তখন আমি হয়তো ঐ বাচ্চা তিনটার মতো ওর জন্য আমার ভালোবাসা থেকে খুব তাড়াতাড়ি অনেক দিনের কাজ করে দেবো। এটা জোর করার ব্যাপার নয়, তোমাদেরও শোনার কথা নয় — এটা আমার ব্যক্তিগত ঘরানার কথা।

তোমরা যে আমার মুখ থেকে শুনছো এটা তোমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে। একটা সময় আগে এই বিষয়ে মাঝে মাঝে কথা বলতাম। পাহাড়ের সেই সম্মেলন থেকে ফিরে আসার পর বলেছিলাম কলমের গাছের কথা। ঢাকায় স্বামীবাগে নটদের বাড়িতে আমি মাঝে মাঝে যেতাম। একদিন নটদের বাড়িতে আমি গিয়েছি, আমার সাথে প্রিয়প্রসাদ ও রবি ঘোষও ছিলো। কিছুক্ষণ পরে দেখি রাম ঠাকুর এসেছে আমাকে খুঁজতে ঐ বাড়িতে। রাম ঠাকুর আমাকে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলে ডাকতো। ও এক সময় পাহাড়ের দিকে কাটিয়েছে। সেদিন কলমের গাছের আলোচনা করেছিলাম। বলেছিলাম আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে আমার সেই কলমের গাছের সামনে বিশাল বিশাল মহাপুরুষরা পর্য্যন্ত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। রবি ঘোষের খুব উৎসাহ ছিলো কলমের গাছ নিয়ে।

কালিদাস- তোমার কাছে আসার সাথে সাথেই কি কলমের গাছ এই status পেয়ে যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর- নাবালকের নামে বাবা অথবা মা ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। সেই টাকা কিন্তু সে সাথে সাথে ব্যবহার করতে পারে না। সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয়। সেরকম প্রকৃতি থেকে কাউকে পাঠাচ্ছে এটা যদি বুঝতে পারি তাহলে আমি আমার খুশিতে আমার কলমের গাছের সীলমোহরটা তাকে দিয়ে দেবো। এটা সম্পূর্ণ আমার মনোজগতের ব্যাপার। এটা কাউকে জানানোর কথা নয়, যে কলমের গাছ হবে সেও জানবে না যে কি বিশাল উত্তরাধিকারী সে হয়ে গেলো। কারণ, যতোটা আড়াল করা সম্ভব ততোটাই ভালো। যাদের জন্য ওর আসা, তারা ওকে ঠিকই বুঝে নেবে। তোমাদের বুঝাতে তো সে আসছে না।

কালিদাস- তুমি যে আড়াল করে রাখার কথা বলছো, এটা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর- একটা খুব মূল্যবান জিনিষ যখন তৈরীর কাজ চলে তখন কাজের সুবিধার জন্য একটু আড়ালেই কাজ করা হয়। এই যে সন্তান দল করেছি, তাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছি আমার আদি বেদের তত্ত্বটা সবার কাছে পৌঁছে দিতে। তারা তো নিজেরা গবেষণা করে তত্ত্বটা বার করছে না, তারা আমার বলা কথাগুলোকে বইয়ের মাধ্যমে, কড়াচাবুকের মাধ্যমে বা নিজেরা বক্তব্য রেখে তুলে ধরছে। একটা কাজ থাকে গবেষণা করে আবিষ্কার করা আরেকটা কাজ হলো সেই আবিষ্কারটাকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই যে শিবপুর কলেজে ছাত্রদের পড়ায় মাস্টাররা — রায় পড়ায় — এখন সেই মাস্টাররা তো সেই বইগুলোর তত্ত্বটা নিজেরা বার করেনি। কোনো বড় বিজ্ঞানী সেটা আবিষ্কার করেছে, এখন মাস্টাররা সেটা ছাত্রদের পড়াচ্ছে। যারা সাধনা করে চলেছে বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে, সেই ক্ষেত্রেও এরকম দুটো শ্রেণী দেখা যায়। একদল নতুন নতুন রাস্তা বের করছে, অন্যেরা সেই আবিষ্কৃত পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। এখন এই যে যারা পথ আবিষ্কার করছে ঃঃ

বেদবাণীঃঃ তাদের সংখ্যা খুবই সীমিত, কিন্তু সেই পথ যারা ব্যবহার করছে তাদের সংখ্যা তো অগণিত। রেডিও তো একজনই আবিষ্কার করেছে, কিন্তু সেই রেডিও কতোজন আজ ব্যবহার করছে তুমি কি সেই সংখ্যা বলতে পারবে? এই মুহূর্তে পৃথিবীতে কতোজন রেডিও শুনছে কারুর পক্ষেই সেটা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ঠিক সেরকম এই বিশ্বতত্ত্বের খনিতে যারা অহর্নিশ ডুবে থেকে নতুন নতুন মূল্যবান জিনিষ বের করে আনছে তাদের Universe থেকে বিশাল status দেওয়া হয়। হরিবন্ধু একদিন বলছিলো যে বিদেশে যারা গবেষণা করে তাদের পড়ানোর কাজ সাধারণতঃ দেওয়া হয় না, তাদের গবেষণার কাজেই রেখে দেওয়া হয়। তারা গবেষণা করে আবিষ্কার করে এবং তাদের সেই আবিষ্কার করা তত্ত্বগুলোই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টাররা পড়িয়ে থাকে। মাস্টারদের যেমন পড়ানোই একমাত্র কাজ, গবেষকদের সেটা নয়। তবে তারা কি পড়ায় না? হ্যাঁ, তারাও মাঝে মাঝে শখে অমুক বিশ্ববিদ্যালয় তমুক বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই দিনের জন্য, তিন দিনের জন্য পড়িয়ে আসে। কিন্তু সেইটুকুই, তারপরে আবার তারা তাদের নিজস্ব গবেষণায় ডুবে যায়। কিন্তু তারা যখন পড়াতে আসে তখন তাদের সেই পড়ানো শুনতে মাস্টাররাও এসে হাজির হয়, কারণ সেই গবেষকরা তো মাস্টারদেরও অনেক উপরে। মাস্টাররা যেটা পড়ায় সেটা তো সেই গবেষকদের আবিষ্কার করা জিনিষই তারা পড়ায়। তাই মাস্টাররাও তখন ছাত্রদের মতো হাত জোড় করে এসে সেই গবেষকের কথা মন দিয়ে শোনে। রায় সেদিন যেমন বলছিলো যে কে একজন বাইরে থেকে আসবে নাম করা কোন বিজ্ঞানী ওদের কলেজে, সে এসে ওদের কলেজের মাস্টারদের ক্লাস নেবে। তোমরা যেটাকে আধ্যাত্মিক জগৎ বলে থাকো সেখানেও এই ঘটনা ঘটে। যারা Universe থেকে এই গবেষণার জন্য মনোনীত তারা যেখানে যায় সবাই হাত জোড় করে এসে দাঁড়ায় — নতুন কি বার্তা পাওয়া গেলো সেই তত্ত্ব খুঁজতে থাকে। আমার কলমের গাছ যে হবে সেও হবে এরকম একজন Universe-এর মহা গবেষক যে Universal mathematics-এর মধ্যে ডুবে থাকবে। তার কাজের মধ্য দিয়ে বিশ্বের নতুন নতুন পথ বের হয়ে আসবে। বড় বড় যোগী ঋষিরা তার নির্দেশিত পথে চলবে। এখন তাকে যদি ২৪ ঘণ্টা তোমাদের কচকচির মধ্যে রাখা হয়, তাহলে পরিবেশের তো একটা প্রভাব আছে — সেই প্রভাব ওর সহজাত প্রতিভার উপর পড়তে পারে। তাই আমার দিক থেকে একটু আড়াল করে রাখার ইচ্ছা। ভালো ছাত্রকে যেমন মা বাবা যতোটা পারে পড়াশোনা করার সুযোগ করে দিতে চায় — এটাও অনেকটা সেরকম। তোমাদের চিন্তাভাবনা তো যুক্তফ্রন্ট, অজয় মুখার্জ্জী, কমিউনিস্ট, বাংলা কংগ্রেস, নব কংগ্রেস — এই সবের উপরে উঠতেই পারছে না। তোমরা যে একদিন মরে যাবে এটা তোমাদের ভাবায় না — তার থেকে অনেক বেশী ভাবায় ছেলের চাকরি, মেয়ের বিয়ে, অসুখ বিসুখ এইসব। তার উপরে তোমাদের এখানকার ভাষা হলো হবে না,

পারবো না, খুব কঠিন, হতাশা, নিরাশা এইসব। এখন তোমাদের এই পরিবেশে থাকতে থাকতে পরিবেশের এই ভাষার প্রভাব যাতে আমার কলমের গাছের উপর না পড়ে তার জন্য তোমাদের মধ্যে রেখেও ওকে একটু আড়াল করে রাখবো। তোমাদের মতো বেদ প্রচারের কাজে ওকে বেশী রাখা হবে না। তবে মাঝে মাঝে যদি নিজের খুশিতে ও কিছু করে সেটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারণ ও তো পথ দিয়ে চলতে আসছে না, ও পথ তৈরী করতে আসছে। যারা ওর সান্নিধ্য পাবে তাদের বিশেষ ভাগ্য — এইভাবেই বলতে হবে। আমি তো আগেই বলেছি পাহাড়ে এখনও খুব বড় বড় কিছু যোগী আছে তারা ওর নির্দেশ পাবার জন্য অপেক্ষা করছে। এই পৃথিবী শুধু না, অন্যান্য জগতের যোগীরাও ওর কথা শুনবে। আমি তো আগেই বলেছি যেখানে অন্যান্যরা শেষ করে আমার কলমের গাছ শুরুই করবে সেখান থেকে। ওর সহজাত speed এতোটাই বেশী থাকবে যে বড় বড় যোগীদের যে কাজ করতে জন্ম লেগে যায় সেটা ও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই করে ফেলতে পারবে। তাই Universe-এর কাছে ও এক মহামূল্যবান বিষয়বস্তু। খুব দামী হীরা যেমন বাজারের মাঝখানে ফেলে রাখা হয় না — খুব যত্ন করে, আদর করে আড়াল করেই রাখে সেরকম ভাবেই ওকে রাখার ইচ্ছা।

রাম নারায়ণ রাম

## 155, Park Street
## 23-9-1967

আজ পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজের কয়েকজন পণ্ডিত শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাদের এক সভায় নিমন্ত্রণ জানাবার জন্য পার্ক স্ট্রীট বাড়িতে এসেছেন। তাদের সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের মামাতো দাদা সুধাংশুমোহন ভট্টাচার্য্য এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে সমাদরে আসন গ্রহণ করতে বলে সকলের খবরাখবর জানলেন। পণ্ডিতদের মধ্যে একজন শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে সভার নিমন্ত্রণপত্র এবং তার সাথে উপহার স্বরূপ মহামহোপাধ্যায় কুঞ্জবিহারী তর্ক সিদ্ধান্তের লেখা সাংখ্যদর্শন বইখানি দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বইটি হাতে নিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখছেন।

সুধাংশু- এই বইটি যিনি লিখেছেন তিনি বাবার শিক্ষক ছিলেন। ইনি মেদিনীমণ্ডলের লোক। তুমিও হয়তো তাকে দেখেও থাকতে পারো।

শ্রীশ্রীঠাকুর- ওর (সুধাংশু) বাবা অর্থাৎ আমার মামা হেরম্বনাথ তর্কতীর্থ তো বিশাল পণ্ডিত। ঢাকায় যখন ছিলাম তখন দেখতাম কতো দূর দূর থেকে ছাত্ররা হেরম্বনাথের কাছে শাস্ত্র শিখবে বলে আসতো। যার লেখা বই আমাকে এখন দিলে তিনি মামাকে পড়িয়েছেন?

সুধাংশু- বাবা প্রথমে মেদিনীমণ্ডলের হেরম্বনাথ ন্যায়রত্নের কাছে পড়তেন। পরে এনার কাছে অর্থাৎ মহামহোপাধ্যায় কুঞ্জবিহারী তর্ক সিদ্ধান্তের কাছে শিক্ষালাভ করেন। এনার কাছে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ করেই তিনি তর্কতীর্থ উপাধি লাভ করেন। ইনি বৈদিক সমাজের খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। সারা ভারত জুড়েই ওনার নামডাক ছিলো। স্বাধীনতার আগে বিভিন্ন দেশীয় রাজাদের রাজসভায় ন্যায়শাস্ত্রের বিচারসভা অনুষ্ঠিত হতো, সেখানে বিচারক হিসাবে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হতো। একসময় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায়শাস্ত্রের এম এ পরীক্ষার পেপার সেটার এবং পরীক্ষকের কাজেও যুক্ত ছিলেন। ওনার লেখা বই তত্ত্ববোধিনী টীকা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ-তে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ানো হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর- শুনে খুব খুশি হলাম। আমাদের পরিবারে সেই ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছি শাস্ত্রের অনুশীলন। ঢাকায় দেখেছি জমিদার যোগেশ দাস মামাকে কি বিশাল শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ভোলাগিরির আশ্রমে যখন যেতাম স্নান করতে তখন মাঝে মাঝেই দেখতাম অনেক পণ্ডিতরা মামাকে ঘিরে বসে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনছেন। (এইসময় সমাগত অতিথিদের জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। জলযোগের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর সমাগত অতিথিদের সকলেরই খোঁজখবর নিলেন। জলযোগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পণ্ডিতরা

শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাদের সভায় যোগদান করবার জন্য বার বার অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নিলেন।)

শ্রীশ্রীঠাকুর উপহারস্বরূপ পাওয়া বইখানি কালিদাসকে দিয়ে যত্ন করে রাখতে বললেন। কালিদাস বইটি রেখে জিজ্ঞাসা করলো — তুমি কি বৈদিক সমাজের সভায় যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর- দেখি, যদি সময় পাই তাহলে যাবো। দর্শন শাস্ত্র নিয়ে এক সময় ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের সাথে অনেক আলোচনা হতো। উনি এবং ওনার স্ত্রী আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। উনি তো একটা বইও লিখেছেন আমাকে নিয়ে, কি যেন নাম।

কালিদাস- শ্রী মৎ বালক ব্রহ্মচারী দর্শনসার।

শ্রীশ্রীঠাকুর- হ্যাঁ। ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার শংকরাচার্য্যের ভক্ত ছিলেন। শংকরাচার্য্যের দর্শনের উপরেই তিনি কাজ করেছেন। একদিন বললেন আপনার এই তত্ত্বকে বুঝতে পারা সহজ নয়, আপনার কাছে শংকরাচার্য্যের মতো কয়েকজন থাকলে আপনাকে কিছুটা বুঝতে পারতো। বোঝো, তিনি নিজে শংকরাচার্য্যের ভক্ত — তিনি এটা বললেন না যে আপনি শংকরাচার্য্যের সমতুল্য, উল্টে বলছেন আমার কাছে নাকি শংকরাচার্য্যের মতো কয়েকজনের থাকা দরকার ছিলো। ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার সাধারণ দার্শনিক ছিলেন না — দেশে বিদেশে তার যথেষ্ট সুনাম। আমাকে খুবই ভালোবাসতেন।

কালিদাস- এখানকার দর্শন নিয়ে তোমার সাথে কি আলোচনা হয়েছিলো?

শ্রীশ্রীঠাকুর- আমি বলেছিলাম, দেখুন এখানকার কোনো শাস্ত্র পড়ার সময় আমার হয়নি। শিশু বয়স থেকে বিশ্বের যে সুর নিয়ে আমি এসেছি সেই সুরেই আমি ডুবে আছি। আপনাদের মতো পাণ্ডিত্যের ভাষা হয়তো আমার নেই কিন্তু বিশ্বের খনি থেকে অমূল্য রত্ন আমি তুলে আনতে পারি। সেই সুরে রয়েছে বিজ্ঞান, যুক্তি, গণিত। আমি অযথা ভাব উচ্ছ্বাসের কথা বলে সাময়িক বাহবা নিতে চাই না। এখানে যে যা বলে গেছে বেশীরভাগটাই কল্পনার উপরে, অনুমানের উপরে দাঁড়িয়ে বলেছে। একটু নজর দিলেই বোঝা যায় যে সেখানে প্রত্যক্ষতার অভাব। যে জিনিষে প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা থাকবে তার সুরই আলাদা। ধরো কাউকে একটা ঘরে জন্ম থেকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। কোনোদিন তাকে বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। সেই ঘরে শুধু ছাদের কাছে একটা ছোটো জানলা আছে বাতাস যাতায়াতের জন্য। সেই জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের খুব সামান্যই দেখা যায়। এইভাবে তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে জন্ম থেকে। তার জীবন ধারণের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা আছে কিন্তু তাকে কোনোদিন বাইরে নিয়ে আসা হয়নি। এখন সেই ব্যক্তি বাইরের যেটুকু সংবাদ পায় সবটাই সেই ছোটো জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে। মাঝে মাঝে নীল আকাশে একটু মেঘ দেখতে পায়, মাঝে মাঝে হয়তো কোনো পাখির ডাক কানে আসে। সেই ঘরের পাশে যদি কোনো গাছ থাকে তাহলে হয়তো সেই

গাছের ডাল বা পাতা দেখতে পায়। এখন সেই ব্যক্তি ঐ সামান্যটুকু দেখে বাইরের বর্ণনা কিভাবে করবে? যে গাছের একটা পাতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না তার পক্ষে কি পুরো গাছটার ছবি আঁকা সম্ভব? যে কোনোদিন পাখি দেখেনি সে শুধু পাখির ডাক শুনে তার চেহারার বর্ণনা করতে পারবে? ঠিক সেরকম এখানকার যতো বড় বড় দার্শনিক, সাধকদের তোমরা নাম শোনো সবাই একপ্রকার বন্দি অবস্থায় আছে — সেটা হলো জন্মমৃত্যুর ছকের মধ্যে বন্দি। যে নিজেই বন্দি হয়ে আছে সে বহির্জগতের বর্ণনা কিভাবে করবে? এখানকার দার্শনিকদের অবস্থাও সেই ঘরে বন্দি লোকটার মতো। কেউ ঐ ছোটো জানলা দিয়ে বর্ষাকালের মেঘে ঢাকা আকাশ দেখে বলে বসলো যে বাইরের আকাশের রং কালো, কেউ শরৎকালের আকাশ দেখে বলে বসলো যে আকাশের রং নীল। যে যখন যে সময়ে আছে সেই সময়ের মতো করে যেটুকু আভাস পাচ্ছে তার উপর ভিত্তি করেই সম্পূর্ণটার বর্ণনা করতে যাচ্ছে এবং তাতেই ভুল হয়ে যাচ্ছে। বাইরের যথার্থ চিত্র তো কেউই সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারছে না! বাইরের অবস্থা কি এটা একমাত্র সেই যথাযথভাবে বলতে পারবে যে বাইরে থেকে সেই ঘরে প্রবেশ করবে, অর্থাৎ যে বন্দি নয় — মুক্ত পুরুষ। তাই একমাত্র জন্মসিদ্ধের পক্ষেই সঠিক সত্যের বার্তা দেওয়া সম্ভব, এখানকার কারুর পক্ষে নয়। কারণ যারা সত্যের সন্ধান দেবে তারা তো নিজেরাই বন্দি হয়ে আছে জন্মমৃত্যুর ছকের মধ্যে! তারা তো জন্মাচ্ছে আর মরছে, আবার জন্মাচ্ছে আবার মরছে — এর বাইরে তো আর বের হতে পারছে না। তারা তো মুক্তপুরুষ নয় তাই তারা কিভাবে কোনোদিন বাইরে না গিয়ে বাইরের পরিপূর্ণ ছবিটা তুলে ধরতে পারবে? সেই জন্যই তাদের কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং তার ফলেই আজকের দিনে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এতো বিবাদ। যিনি জন্মসিদ্ধ হয়ে এসেছেন তিনি যেহেতু জন্মমৃত্যুর ছকের বাইরে থেকে এসেছেন সেহেতু, একমাত্র তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব এই বিশ্বপ্রকৃতির সঠিক তত্ত্ব, এই অনন্ত মহাকাশের দর্শন একমাত্র তার পক্ষেই যথার্থরূপে তুলে ধরা সম্ভব। তোমাদের ঠাকুর সেই শিশু বয়স থেকে অনন্ত বিশ্বের সেই সত্যসুরের বীণা অবিরাম বাজিয়ে চলেছে। আমি চাই সেই পরমানন্দের সুরে তোমাদেরকেও পৌঁছিয়ে দিতে। তার জন্যই এতো পরিশ্রম করে চলেছি দিবারাত্র। তোমরা তো বুঝতে পারছো না আমি তোমাদের জন্য কি করে চলেছি। তোমরাও তো সেই ঘরে বন্দির মতো অবস্থায় পড়ে আছো। এখানকার একটু আনন্দেই তোমরা পাগল হয়ে যাচ্ছো, বাইরে যে এর অনন্ত কোটি গুণ আনন্দের মহাসাগর পড়ে আছে তা বুঝে উঠতে পারছো না কারণ তোমাদের কোটি কোটি জন্মের অপরাধের যে বোঝা জমা হয়ে রয়েছে, সেই বোঝার তাপটাই তোমাদের সত্যকে বুঝবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি দিবারাত্র একটা চিন্তাই করে চলেছি — কিভাবে তোমাদের কোটি কোটি জন্মের অপরাধের বোঝা পরিষ্কার করে

সেই বন্দিদশা থেকে অর্থাৎ এই জন্মমৃত্যুর ছকের বাইরে তোমাদের নিয়ে ফেলা যায়। আমি যে তোমাদের কতো বড় পরমবন্ধু তা তোমরা বুঝতে পারছো না। তোমরা সামান্য চাওয়া পাওয়ার কারণে আমাকে মান অভিমানের মধ্যে ফেলে দিচ্ছো। তোমরা যদি বুঝে নিতে পারতে এই বিশ্বতত্ত্ব তাহলে আমার কাজটা উপলব্ধি করা তোমাদের পক্ষে সহজ হয়ে যেতো। আমার এই কষ্টের কথা তো কাউকে বলতে পারছি না। আমি যে বিশ্বতত্ত্বের মহাসাগর থেকে এসেছি সেখানে বিশ্বপ্রকৃতির কোনো আইনের অধীন আমি নই। কিন্তু দেহ নিয়ে এসে এখানে আমি আইন মেনে চলেছি। যতোদিন দেহ নিয়ে থাকবো ততোদিন আমাকে এই আইন মেনে চলতে হবে। এটাকেই আমি বিশ্বপ্রকৃতির রেকর্ড বলে থাকি। এই রেকর্ড আমার ঠিক রেখে যেতে হবে। কোনো অবস্থাতেই আমি আমার এই লাইন থেকে সরে যাবো না। তাতে তোমরা যদি আমাকে ভুল বুঝে আমার থেকে দূরে সরে যাও তাহলেও আমার কিছু করার নেই। তোমাদের খুশি করতে গিয়ে আমি আমার এই ইউনিভার্সের রেকর্ড নষ্ট হতে দিতে পারি না। এখন যদি তোমাদের খুশির কথা চিন্তা করে আমি কাজ করি তাহলে যেদিন তোমাদের বুঝ ফুটবে সেদিন তোমরাই আবার আমাকে বলবে — আমরা তো অবুঝ ছিলাম, তুমি কেন আমাদের মতো অবুঝদের কথায় চলতে গেছো? তাই আমাকে আমার বিশ্বের আইনের পথেই চলতে হবে। এখন আমি রেকর্ডের মধ্যে আছি বলে তোমরা আমাকে যখন খুশি কাছে পাচ্ছো, কিন্তু যখন এই রেকর্ড শেষ করে যাবো তখন এমন একটা সূক্ষ্মচেতনার অবস্থায় চলে যেতে পারি যেখানে আমার নাগাল পাওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

কালিদাস- তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে আমাদের কি হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর- এখানে ছেড়ে যাওয়ার কথা আসছে না, আমি বলছি নাগালের বাইরে থাকার কথা। যেমন এখানে যে ব্যক্তি মারা যায়, এই যে তিলু চলে গেছে, দ্বিজেন চলে গেলো — এই যাওয়া মানে তো একেবারেই চলে যায়নি — কোথাও না কোথাও তো ঠিকই তারা আছে। কিন্তু যেখানেই থাকুক না কেন তোমরা তো তিলুকে বা দ্বিজেনকে এখন তোমাদের নাগালের মধ্যে পাচ্ছো না! এখন নাগালের মধ্যে পাচ্ছো না বলে যে ওরা নেই তা তো নয়। তারা ঠিকই আছে। তোমাদের ডাক ওরা ঠিকই শুনতে পায় কিন্তু তোমাদের কাছে ধরা দেবার মতো করে আসতে পারবে সেরকম ক্ষমতা ওদের নেই তাই আসতে পারছে না। বিলেতে তোমার যদি কোনো আত্মীয় থাকে তুমি তো তাকে ইচ্ছা করলেই কাছে পেতে পারো না। পাসপোর্ট ভিসা করতে হবে, জাহাজের টিকিট কাটতে হবে — তারপরে সে আসতে পারবে। এখন এই পাসপোর্ট, টিকিটের ব্যবস্থাটা হয় তাকে করে নিতে হবে, নয় তার হয়ে তোমাকে করে দিতে হবে। কাউকে না কাউকে তো করতে হবে, তবেই তার সাথে তোমার দেখা হতে পারে। ঠিক সেরকম যারা এখান থেকে চলে

গেছে তাদের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করতে হলে হয় তাকে নয় তোমাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এখন যে আসবে এবং যার কাছে আসবে দুজনেই যদি খুব গরীব হয় তাহলে এই পাসপোর্ট, টিকিটের ব্যবস্থা কিভাবে হবে? তাই তোমাদের কাছে তারা এসে দাঁড়াতে পারছে না — কারণ তাদেরও আসবার মতো পুঁজি তৈরী হয় নি, তোমাদেরও এমন পুঁজি নেই যে সেই পুঁজি দিয়ে তাকে আনার ব্যবস্থা করা যায়। সেক্ষেত্রে এটাই বলতে হবে যে তারা ঠিকই আছে তবে তোমাদের নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। আমি যখন চলে যাবো আমি ইচ্ছা করলেই আমার পুঁজি ব্যবহার করে তোমাদের সাথে এসে দেখা করতে পারবো। কিন্তু কারুর সাথে যদি আমি ইচ্ছা করে দেখা করি তখন যে পেলো না সে দুঃখ পেতে পারে। যেমন আমি যদি শিবপুরে রায়ের সাথে দেখা করে আসি তাহলে কালিদাস দুঃখ পেতে পারে যে ঠাকুর আমাকে দেখা দিলেন না। তাই তখন আমার এই ইচ্ছাটা আমি আমার হাতে না রেখে তোমাদের ডাকের উপরেই ছেড়ে দেবো। যে আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে পারবে তার কাছেই আমি যাবো। কিন্তু এখন যেভাবে আমাকে পাচ্ছো, চার আনা আট আনা খরচা করে যখন খুশি পার্ক স্ট্রীটে এসে দেখা করতে পারছো সেরকম হবে না। আমি এই মহাকাশের মহাচৈতন্যে যেখানে মিশে ছিলাম সেই সুরের মধ্যেই আমার সত্তা মহাকাশ হয়ে লীন হয়ে থাকবে। এখনকার মতো তোমরা সহজে আমার নাগাল পাবে না। তোমাদের নাগালের বাইরে বলে যে আমি নেই, তা তো নয়। আমি সদাসর্বদা ঠিকই থেকে যাবো। এই যে ধূপকাঠিটা একটু আগেও জ্বলছিলো তখন তো ধূঁয়া দেখা যাচ্ছিলো, সবাই গন্ধও পাচ্ছিলো। কিছুক্ষণ আগে নিভে গেছে। এখন ধূঁয়া দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গন্ধ এখনও কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ পরে গন্ধটাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাই বলে কি গন্ধটা পুরোটাই চলে গেছে? তোমাদের নাকের নাগালের বাইরে চলে গেলেও খুব সূক্ষ্ম আকারে তখনও কিছুটা গন্ধ এই বাতাসে মিশে থাকবে। তুমি হয়তো তখন সেই গন্ধ পাচ্ছো না কিন্তু এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী আছে যে সেই ধূপের গন্ধ তখনও পেয়ে চলেছে। সেরকম আমার চেতনাটাও আমার দেহ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর পরিপূর্ণ জাগ্রত অবস্থাতেই থাকবে এখনকার মতো কিন্তু এমন সূক্ষ্ম আকারে চলে যাবে যে তোমাদের নাগালের বাইরে থাকবে। তোমাদের মতো করে দেখা দিতে হলে অনেকটা স্থূল আকারে নেমে এসে তবে দেখা দিতে হবে। বাষ্পটা এমনি দেখা যায় না, যখন সেই বাষ্পই বরফ আকারে রূপ নেয় তখন তাকে দেখাও যায়, স্পর্শও করা যায় — এটাও অনেকটা সেরকম। তাই তোমাদের সাথে আমি ঠিকই থেকে যাবো কিন্তু তোমরা এখন যেভাবে আমাকে দেখছো সেভাবে মাঝে মাঝে আমার দেখা পেলেও সব সময় পাবে না। এটা শুধু তোমাদের ক্ষেত্রেই সত্য না, এটা যারা এই ইউনিভার্সে খুব বড় বড় হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও সত্যি। আমি যেহেতু তাদের চেতনারও অনেক উঁচুতে, অনেক

সূক্ষ্মে ফলে তারাও খুব সূক্ষ্ম অবস্থাতে অবস্থিত হয়েও আমার নাগাল পাবে না। ঃঃ বেদবাণী ঃঃ আমার চেতনাটাকে এই বিশ্বে শূন্যবৎ বলা হয়েছে। যারা খুব উঁচুতে উঠে গেছে, খুব বড় বড় হয়ে গেছে তারাও আমার অস্তিত্বের নাগাল পেয়ে উঠছে না। কারণ যে সূক্ষ্মতায় তাদের অস্তিত্ব থাকে আমার অবস্থান যে তারও উপরে। ফলে তাদের অস্তিত্বই বিঘ্নিত হয়ে পড়ছে। যে বিষয়বস্তু দিয়ে জলের অণু তৈরী হয়েছে, সেই বিষয়বস্তুকে গ্রাহ্যে আনা জলের পক্ষে সম্ভব নয় — কারণ জল সেই অবস্থাতে গেলে সেটা আর জল থাকে না, অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এখন নিজের অস্তিত্বই যদি না থাকে তাহলে আর কাকেই বা ধরবে, কার ধ্যানই বা করবে! এই চিন্তা থেকেই তো কলমের গাছের ভাবনা এসেছে। এই কলমের গাছ হয়ে যে আসবে সে সর্ব অবস্থাতেই আমাকে তার নিজের নাগালের মধ্যে আনতে পারবে। যতো সূক্ষ্মেই আমি চলে যাই না কেন, এমন একটা সূক্ষ্ম তম অবস্থা আসতে পারে যার নাগাল হয়তো কেউই পাবে না — সেখানেও সে স্বমহিমায় থেকে আমার সাথে আদান প্রদানে থেকে communication চালিয়ে যেতে পারবে। যারা দেবতা হয়ে গেছে তারা তখন সেই কলমের গাছের থেকেই আমার বার্তাটা জেনে নিতে পারবে। তাই কলমের গাছ জন্ম নেবে তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছাতেই। পাহাড়ে যারা কাজ করে চলেছে তারাও তো হাতজোড় করে বসে আছে ওর জন্য। ১৯৩৮ বা ৩৯ সালে গ্যাংটক ছাড়িয়ে পাহাড়ের দিকে গিয়েছিলাম। সেইবার ফিরে এসে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে সীতাকুণ্ড হয়ে মেসোমশাইয়ের বাড়ি চট্টগ্রামে এসে দেখি রবি ঘোষ আর কালা ডাক্তার আমার সাথে দেখা করবে বলে মেসোমশাইয়ের বাড়িতে এসেছে। আমার সঙ্গে তখন চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে একজন শিবের ভক্তও সাথে সাথে এসেছিলো। ওদের বলেছিলাম — আমার সন্তান পৃথিবীতে বড় বড় যোগীদের কাছে পূজা পাবে। এখানে সবাই কাজ করে, কিন্তু ও যেটা করবে সেটা আর কেউ করতে পারবে কিনা আমার জানা নেই। ওর কাজ হবে আত্মাজগতের কাজ, বাস্তবজগতের কাজ যা তোমাদের বোধে আসে সেরকম কাজে আমার ওকে রাখার একেবারেই ইচ্ছা নেই। এখানকার সামান্য বুদ্ধি দিয়ে হয়তো তোমরা ওর নাগাল পেয়ে উঠবে না। ওর সামান্য খুশিতে বহু যোগী এবং সাধক এই অনন্ত বিশ্বের অনেক অজানা মহামূল্যবান আশ্চর্য পরম সম্পদের সন্ধান পেয়ে যাবে। ওর খুশিতে আমিও হস্তক্ষেপ করবো না। নিজের সন্তান বলে বলছি না, আমার সেই সন্তানের সান্নিধ্যে যারা আসতে পারবে তারা বিশেষ ভাগ্যের অধিকারী এইভাবেই আমি বিষয়টাকে দেখি। পাহাড়ে যারা আইনের কারণে আমার কাছে আসতে পারলো না, তারা অধীর আগ্রহে আমার সেই সন্তানের আসার পথ চেয়ে বসে আছে। সূর্য্যের দিকে তাকানো যায় না, কিন্তু দেখো তো সেই সূর্য্যের আলোয় যে আলোকিত চন্দ্র তার দিকে তো কি সুন্দর তাকিয়ে থাকা যায়। রাতের বেলায় যখন সূর্য্যের আলো থাকে

না তখন চাঁদের মাধ্যমেই সূর্য্য তাঁর আলো দান করে। আমার সন্তানও আমার আলোতে আলোকিত হয়ে পাহাড়ের যোগীদের সেই পরম তত্ত্বের আলো দান করবে। তারা পূজা করে তাকে বলবে — এই গভীর রাত্রিতে আমরা আশা করছি ভোরবেলা সূর্য্যের দর্শন পাবো। কিন্তু যতোক্ষণ না সেই সূর্য্যের দেখা পাচ্ছি ততোক্ষণ তাঁর সেই পরম আলোর সন্ধান তোমার থেকেই আমাদের নিতে দাও। তুমি তো চাঁদ হয়ে সেই সূর্য্যকেই বুকে বহন করে নিয়ে চলেছো। আশা আমরা রাখছি ভোর হবে, সূর্য্য উঠবে — কিন্তু সেটা যে কবে হবে তা তো আমাদের জানা নেই। এতো হাজার হাজার জন্ম ধরে তো অন্ধকারের মাঝেই কাটিয়ে চলেছি। বহু যুগ পরে যখন আলোর সন্ধান পেয়েছি তখন দয়া করে তার থেকে আমাদের বঞ্চিত কোরো না। (শ্রীশ্রীঠাকুর এই সময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন)। বহু হাজার সাধকের এবং যোগীদের এমনকি দেবতাদের আকুল আর্তি -- শুধু এই পৃথিবীরই না, অন্যান্য জগতেরও — তাদের আকুল ডাক কিছুদিন ধরেই বুকে এসে বাড়ি খাচ্ছে। তোমরা আমাকে একটু বুঝতে চেষ্টা কোরো।

রাম নারায়ণ রাম

তাঁর প্রাণের বাবনের সঙ্গে শ্রী শ্রী ঠাকুর

## 155, Park Street
## 26-9-1967 (রাত্রিবেলা)

শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে মনাই ফকিরের গাওয়া আল্লা তাল্লাহর গান গাইছেন। কিছুক্ষণ গাওয়ার পর বললেন — মনাই ফকির খুব সুন্দর গাইতো। একেবারে তন্ময় হয়ে থাকতো।

কুসুমদি এবং কালিদাস- আরেকটু গাও, খুব ভালো লাগছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও কিছুক্ষণ গান গেয়ে বলা শুরু করলেন — মনাই ফকির অনেক রাত্রে আমার কাছে এসে বসতো। আমার তখন ৫-৬ বছর বয়স। আমি ছোটো একটা বাঁশের ঘর করেছিলাম। ঐ জগদীশ হাইরা, তারপর অজিত নমঃ, নিকুঞ্জ ভূইমালি এরকম আরও কয়েকজন মিলে ঐ ঘরটা তৈরী করে- ছিলো। আমিও ওদের সাথে হাত লাগিয়েছিলাম। ঐ ঘরে সারারাত বসে থাকতাম, জগদীশ হাইরা ও আরও কয়েকজন এসে মাঝে মাঝে বসতো — ওরা মাঝে মাঝে ধূনা জ্বালাতো। মনাই ফকিরও গভীর রাত্রে ঐ ঘরে এসে বসতো। আলাউদ্দিন, আফতাবুদ্দিন — এদের গুরু ছিলো মনাই ফকির। মনাই ফকির খুব বড় সাধক ছিলো, লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বন্ধু ছিলো। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে লোকনাথের সাথে মনাই ফকিরের দেখা হয়েছিলো। মনাই ফকির সারাদিন আমাদের বাড়ির কিছু দূরে একটা সুপারি বাগান ছিলো, ঐখানেই থাকতো। গভীর রাত্রে আমার ঘরে এসে বসতো। সারারাত আমি বসে থাকতাম, মনাই ফকিরও বসে থাকতো — ভোরবেলা চলে যেতো ঐ সুপারি বাগানে। ঐ সময় রাত্রিবেলা কয়েকটা সাপ ও শেয়াল আমার কাছে এসে বসতো। একটা খুব বড় সাপ ছিলো। সেটা আবার আমার ঘরের মাটির মেঝেতে একটা গর্ত মতো ছিলো, সেখানেই থাকা শুরু করলো। আমি কাজে বসলেই সাপটা আস্তে আস্তে গর্ত থেকে বের হয়ে পাশে এসে বসতো। একবার বর্ষার সময় খুব বৃষ্টি হচ্ছে — অনেক রাত্রি তখন, মনাই ফকির দেখে একজন বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে মনাই ফকিরের পাশে বসে আছে। ভোরবেলা সেই বৃদ্ধ যখন চোখ খুলেছে তখন মনাই ফকির তাকে জিজ্ঞাসা করছে — আপনি কে? সেই বৃদ্ধ তখন বলছে — আমার নাম জগদীশ। মনাই ফকির তখন জিজ্ঞাসা করছে — আপনি এখানে এলেন কোথা থেকে? সেই বৃদ্ধ উত্তর দিচ্ছে — আমি এই পরিবেশেই ঘুরে বেড়াই, কখন কোথায় থাকি ঠিক নেই। আমি আসি এই ছোট্ট শিশুর টানে। এই ছোট্ট শিশু যখন কাজে বসে তখন এমন এক আলোর প্রকাশ ঘটে যার সন্ধান আমি আজ পর্য্যন্ত কোথাও পাইনি। এই আলো মনে হয় এই শিশুর নিজস্ব সম্পত্তি। মনাই ফকির চুপ করে সেই বৃদ্ধের কথা শুনছে। সেই বৃদ্ধের চেহারা অতি অপূর্ব, শুভ্র কেশ, শুভ্র দাড়ি। এইভাবে মাঝে মাঝেই সেই বৃদ্ধ তখন আসতো।

কালিদাস- তুমি যে বৃদ্ধের কথা বলছো তিনি কি স্বয়ং মহাদেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর- সেটা আমি কিভাবে বলবো? মনাই ফকির থাকলে ওকে জিজ্ঞাসা করতে পারতে।

কুসুমদি- সেদিন তো সুখচরের বাড়িতে গিয়ে শিবমন্দিরের সামনে শিব সম্পর্কে কতো কথা বললে।

শ্রীশ্রীঠাকুর- শিব তোমাদের মতো সাধারণ ঘরেই জন্মগ্রহণ করেছিলো, তারপর নিজের সাধনার বলে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। এরকম দেখা যায় না। কতো প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে গেছে, কিন্তু কখনও পিছপা দেয়নি। তাই তো শিবকে এতো বড় স্থান দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে দেবাদিদেব মহাদেব।

কালিদাস- সেই শিব কি এখনও সাধনা করে চলেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর- এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাজে সবাইকেই যুক্ত থাকতে হয়। একেক অবস্থায় একেক চেতনার প্রকাশের মাঝ দিয়ে সবাই যায়। বিভিন্ন সময়ে যার যার মাত্রা অনুযায়ী একেকজন একেক রকম কাজ করে থাকে। এই শিব একসময় সমাজ গঠনের কাজে যুক্ত ছিলেন। ত্রিশূল দিয়ে পাথর তুলে তুলে কতো জমিকে চাষের উপযোগী করে তৈরী করেছিলেন, মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু গভীর চেতনার মাঝে উপস্থিত হয়ে এমন এক সাড়ার সন্ধান পেলেন যেখানে পৌঁছে শিবের কর্মের ধারা একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেলো। তারপর আর শিবের খোঁজ পাওয়া যায়নি, ঐ হিমালয়ের দিকেই শেষ জীবন সাধনা করে গেছেন।

কালিদাস- যদি আরেকটু বুঝিয়ে বলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর- তোমরা যখন ডাক্তারের কাছে ব্যথা বেদনা নিয়ে যাও তখন সেই ব্যথা নিবারণের জন্য ওষুধ দেওয়া হয়। একটা হলো সাময়িক বেদনা যাতে উপশম হয় তার ব্যবস্থা, আর তার থেকে বড় ডাক্তার যিনি আছেন তিনি শুধু সাময়িক ব্যথার উপশমের মধ্যে না থেকে একেবারে রোগের মূল উৎপাটনের ব্যবস্থা করেন। Pain killer দিয়ে সাময়িক ব্যথা বেদনার উপশম করাটা বড় কাজ না একেবারে কোনোদিন যাতে আর সেই রোগ না হয় সেই ব্যবস্থা করাটা বড় কাজ? নিশ্চয়ই রোগের মূল উৎপাটন করাটা বড় কাজ, তাই তো? সেজন্য এখানকার রোগ শোক সারানো হলো ঐ Pain killer বড়ি দিয়ে সাময়িক ব্যথা কমানোর চেষ্টা আর তার থেকে বড় যিনি তিনি চাইবেন কিভাবে চিরকালের জন্য রোগমুক্ত করা যায়, যাতে কোনোদিনই আর সেই রোগের প্রকোপে পড়তে না হয়। তাই শিবও একদিন বসে গেলেন সেই পরম সমাধানের খোঁজে যে সুরের সন্ধান পেলে আর কোনদিনই এই পৃথিবীর ব্যথা বেদনার কবলে পড়তে না হয়। সেই চিরযুগের পরম সমাধানের খোঁজে শিব নিজেকে আত্মোৎসর্গ করলেন। তিনি এটাই দেখলেন যে এখানকার রোগ শোক অভাব অভিযোগ যেমন দূর করা প্রয়োজন ঠিক সেরকম কিভাবে চিরকালের জন্য এই সমস্যাগুলোর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেটার চেষ্টা করাটাও দরকার। গভীর সাধনায় ডুবে থেকে তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টির আদি সুরের সন্ধানে নিজেকে ছেড়ে দিলেন।

এই ব্যথা কেন, এই বেদনা কেন, এই আঘাত কেন — এর দ্বারা প্রকৃতির আদি সৃষ্টিরহস্যের কি বার্তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে সেই সাধনার পথেই তিনি এগিয়ে চললেন। (এই সময় শ্যামবাজার বাড়ি থেকে একটা ফোন আসে এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ফোনে কিছুক্ষণ কথা বললেন।)

শ্রীশ্রীঠাকুর- মায়ের পেটে একটা ব্যথার মতো হয়েছে তাই দ্বিজু ফোন করে জানালো। কি যেন বলছিলাম।

কালিদাস- শিবের কথা বলছিলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর- শুধু শিব বলে নয় আরও যারা বড় বড় হয়ে গেছেন তারাও সৃষ্টিরহস্যের গভীর সুরে ডুবে রয়েছে। আমি যখন ছোটোবেলায় কাজে বসতাম এরকম অনেকে দেখা করতে আসতো। আমি যে এসেছি, আমার নিজের খুশিতে আমি এসেছি — অনেকের অনুরোধে এসেছি, যাতে ওরা দেখতে পারে দেহ নিয়ে এসে, অনেক নীচু মাত্রা থেকে শুরু করেও কিভাবে সেই পরম সুরের মাত্রায় পোঁছানো যায়। আমার নিজস্ব মাত্রা থেকে অনেক নীচে নেমে আমাকে আসতে হয়েছে। সেই নীচু মাত্রা থেকে শুরু করে কিভাবে আবার পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছাতে হয় সেই কাজ আমি ৫/৬ বছর বয়স থেকে শুরু করে ২০/২১ বছর বয়সের মধ্যে করে দেখিয়েছি। সবাই অবাক হয়ে গেছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমাকে করাই যেতে পারে। যতোই নীচু মাত্রায় আমি নিজেকে নামিয়ে আনি না কেন আমার যে সহজাত বুঝ সেটা তো আমার সাথে সাথেই রয়ে গেছে। যেমন দেওয়ালের ওপারে কোনো আগুন থাকলে তার তাপ তো দেওয়াল ভেদ করে এপারেও এসে লাগে। এটাও সেরকম। আমার সহজাত বুঝের যে তাপ সেই তাপ তো তার প্রকাশ করেই চলেছে। ছোটোবেলায় একবার স্কুলের পরীক্ষার সময় একজন এসেছে আমার কাছে পরীক্ষায় কি কি প্রশ্ন এসেছে এটা জানতে। মাস্টারমশাই প্রশ্ন করার জন্য ওর বইটা নিয়েছিলো। আমি বললাম তুই বইটা নিয়ে আয়। আমাদের সেই মাস্টারমশাই তামাক খেতেন। আমি ওর বইটা খুঁজে খুঁজে ঐ একটু হাতের ছাপ, একটু তামাকের চিহ্ন, বইয়ের কোনো পাতার উপরে কাগজ রেখে যে প্রশ্ন লিখেছে সেরকম চিহ্ন দেখে দেখে ৭/৮টা প্রশ্ন ওকে বলে দিলাম, ঠিক সেই ৭/৮টা প্রশ্ন ও দেখে পরীক্ষায় এসেছে। এটা কিন্তু কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রয়োগ করলাম না, শুধু আমার বুঝের যন্ত্রটা এতো পাকা যে যেটা সাধারণের চোখে সহজে ধরা পড়ে না সেটা আমার যন্ত্রে এসে সাড়া দেয়। শিশুবয়স থেকে, ৫/৬ বছর বয়স থেকে সেই বুঝের সাড়ায় সাড়া দিয়ে দিয়ে আমি বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যের গভীরে পৌঁছে দেখেছি এই সৃষ্টির অন্তর্নিহিত রহস্য। কোটি কোটি বছর ধরে এই মহাবিশ্বের নানা জায়গায় অনেক বড় বড় মহান এই সমাধানের জন্য কাজ করে চলেছেন। তারা সব বিরাট বিরাট মহান। সবাই কাজ করে চলেছে। সেই সমাধানের পথটাকে সহজ

করার জন্যই মনে হয় কিছুদিন ধরে যে কলমের গাছের কথা বলছি, এইদিকে তাকিয়েই প্রকৃতির থেকে কলমের গাছের চিন্তা এসেছে। প্রকৃতি যেন বলতে চাইছে শুধু আমার পূর্ণত্বে পৌঁছানোই নয়, অপর কাউকেও সেই পূর্ণ মাত্রায় যেন আমি পৌঁছে দিয়ে যাই। প্রকৃতি থেকে কাউকে কলমের গাছ করে পাঠালে তাকে যদি আমি তৈরী করতে পারি তখন তার মাধ্যমে অনেকেই সেই আদিঅন্তহীন বিশ্বের সুরের সাড়া অতি সহজেই পেয়ে যাবে। কারণ, যাকে তৈরী করবো তার মধ্য দিয়ে আমার চিন্তাটাই তো reflected হবে। আমি যে record নিয়ে এসেছি সেটা রাখতে গিয়ে অন্য কোনোদিকে তাকাতে পারছি না। একবার তৈরী করে দিতে পারলে তখন যারা খুব বড় বড় হয়ে গেছে তাদের কাজের ক্ষেত্রে সেই কলমের গাছ খুব সুবিধা করে দিতে পারবে। অনেক বছরের পরিশ্রম ওদের বেঁচে যাবে। পাহাড়ে এখনও অনেকে আছে যারা এরকম একজনের আশায় বসে আছে। আমার সেই সন্তান, যে কলমের গাছ হয়ে তাদের কাছে যাবে — যদি যায় — তাকে তারা পরম শ্রদ্ধায়, পরম ভালোবাসায় ঈশ্বরজ্ঞানে জড়িয়ে ধরবে।

কালিদাস- পাহাড় বলতে কি শুধু হিমালয়ের দিকটাতেই আছে না পৃথিবীর অন্য কোথাও এরকম উঁচু stage-এর সাধকেরা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর- হিমালয়ের দিকটাতেই বেশী, ওখানে একটা অঞ্চলই আছে যেখানে এরা বসবাস করে।

কালিদাস- তুমি যেবার গয়ায় গিয়েছিলে সেখানে বলেছিলে যে নর্মদার দিকেও কিছু আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর- থাকতে পারে কিছু, তবে হিমালয়ের মতো অতো উঁচু না ওরা। যে যেখানেই থাকুক না কেন আমার সেই কলমের গাছকে নিজেদের স্বার্থেই খুঁজে নেবে।

কালিদাস- কলমের গাছ কি তাহলে নর্মদা আর হিমালয় দুই দিকেই যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর- আমার কলমের গাছ কোথাও যেতে বাধ্য নয়, তবে যদি খুশি থাকে তাহলেই যাবে। সে তার আপন খেয়াল খুশিতে চলবে। এটা জোর করে করার ব্যাপার নয়। তবে যখন বসে আছে সবাই ওর জন্য, তখন তাদের সবার আকুল ব্যাকুল ডাকে ও সাড়া দেবে এটা আশা করা যেতে পারে। সেটা হিমালয়ও হতে পারে আবার কালিদাস যে নর্মদার কথা বললো সেটাও হতে পারে। তারা তাদের ব্যক্তিগত তাগিদেই সেই কলমের গাছকে খুঁজে নেবে। এরপর যদি আমার সেই কলমের গাছ তাদের উপর খুশি হয়ে তাদের কাছে যায় তাহলে সেটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার।

কালিদাস- আমরা তাকে দেখতে পাবো না?

শ্রীশ্রীঠাকুর- আমি তো আগেই বলেছি আমার চেষ্টা থাকবে তাকে আড়াল করে রাখার। কারণ এখানকার ঝগড়া, বিবাদ, হিংসা এসব থেকে যতোটা দূরে রাখা যায় ততোটাই

ভালো। আমার কলমের গাছ হবে বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদ। এখানকার সাধারণের ঈর্ষার হাত থেকেও তো ওকে বাঁচাতে হবে। আমার কলমের গাছকে তৈরী করার সময় আমি নিজেও ওকে বুঝতে দেবো না যে কতো বড় মহামূল্যবান বিষয়বস্তুর মালিক ও হতে চলেছে। শুধু দূর থেকে নজর রেখে যাবো। কারণ ঐ যে আগেই বললাম বিশ্বের সেই আদিতম সুরের সন্ধান নিয়ে আসবে আমার সেই সন্তান যাকে আমি কলমের গাছ করে তৈরী করবো, সকল সমস্যার অতি সহজ সমাধান ওর কাছ থেকে নিতে বিশাল বিশাল মহাপুরুষরা আসবে। তোমাদের চিন্তাধারার যে মাত্রা, তাতে তোমরা এই পৃথিবীর অভাব, রোগ, শোক এর বেশী ভাবতে পারো না। তাই তোমাদের সাথে যখন কথা বলি এখানকার সমস্যা নিয়েই বেশী কথা বলি, কারণ আরও উঁচুর ভাবনা সবাই খুব একটা বেশী ভেবে উঠতে পারে না। কিন্তু যারা উঁচুতে উঠে গেছে তাদের চিন্তা অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়। তারা এই সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যের সাধনায় ডুবে আছে, সেই সাধনার সুর আমার কলমের গাছ থেকে তারা জেনে নেবে। তাই তোমরা তাকে চিনতে পারলে কিনা সেটা বড় কথা নয়, যারা খুব উঁচুতে উঠে গেছে — তারাই ওকে খুঁজে বার করে নেবে। তোমাদের মতো সাধারণদের মধ্যে যে বা যারা ওকে চিনে নিতে পারবে, বুঝে নিতে পারবে তারা বিশেষ ভাগ্যবান, তারা মহা ভাগ্যের অধিকারী এইভাবেই বলতে হচ্ছে।

কালিদাস- সেদিন ধীরেন ঘোষ বলছিলো যে তোমার কলমের গাছ যে হবে সে নাকি শিবতুল্য হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন — এই বিষয় নিয়ে বাইরে বেশী আলোচনা না করাই ভালো। এইটুকু শুধু বলতে পারি যে এই পৃথিবীতে যারা সাধনা করে বড় হয়েছে, তারা যেখানে শেষ করেছে — আমার সেই সন্তান, আমার সেই কলমের গাছ শুরুই করবে তারও অনেক উপর থেকে। একজন পিতা কতো কষ্ট করে একটা বাড়ি করলো, কিন্তু তার সন্তান যখন ব্যবসা শুরু করছে সে কিন্তু পিতার ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়েই শুরু করছে। বুঝতে পেরেছো? তোমার হয়তো একদিন কিছুই ছিলো না, খুব দরিদ্র অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছো। তারপর খুব কষ্ট করে, পরিশ্রম করে একটা দোকান করলে, একটা বাড়ি করলে। তোমার সন্তান যখন ব্যবসার কাজে হাত লাগালো ওকে কিন্তু অতো কষ্ট করে শুরু করতে হলো না। শুরু থেকেই সে একটা তৈরী বাড়ি পাচ্ছে, তৈরী দোকান পাচ্ছে। এটাও অনেকটা সেরকম। আমার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার তো আমার সন্তানই হবে। তাই কলমের গাছ হয়ে যে আসবে তার মূল্য অসীম। আমার সেই সন্তান যে কলমের গাছ হয়ে আসবে তাকে ভালোবেসে কতোজন যে আমার কাছে পৌঁছে যাবে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। অনেকেই ওর আশায় বসে আছে।

রাম নারায়ণ রাম

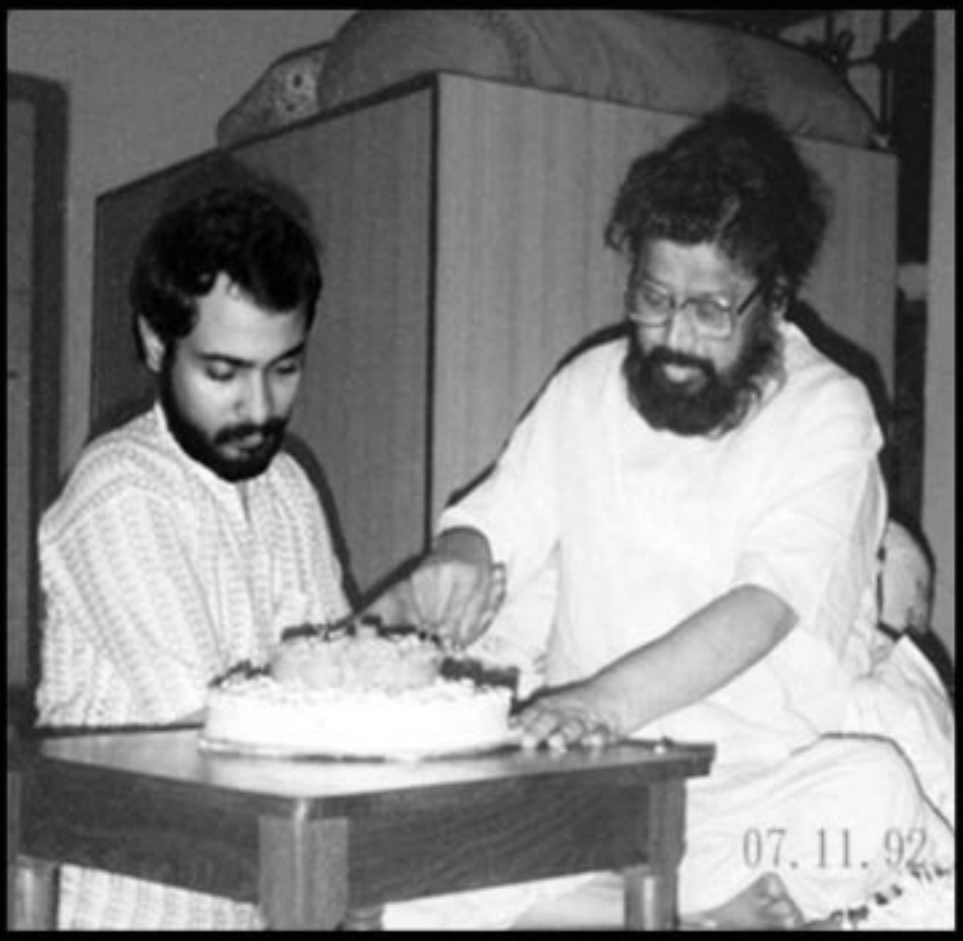


তাঁর চোখের মণি বাবনের শুভ জন্মদিন উদ্‌যাপনে শ্রী শ্রী ঠাকুর

## 155, Park Street
## 30-9-1967
## 3.00 p.m.

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের ঘরে বসে ছিলেন, কালিদাস ফোনে একজনের সাথে কথা বলে সামনে দাঁড়ানোয় শ্রীশ্রীঠাকুর কালিদাসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কখন ফোনটা ঠিক হলো।

কালিদাস- এই তো ঘন্টাখানেক আগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর- মা তো কালকে এসে জিজ্ঞাসা করছিলো ফোনটা কবে ঠিক হবে। গৌরীশংকর যেন শ্যামবাজারে একটা ফোন করে জানিয়ে দেয়।

কালিদাস- রেবাদি ফোন করে জানতে চেয়েছে কালকে ক্লাস হবে কিনা। আমি বলেছি ঠাকুরের শরীর ভালো নয়, এই মুহূর্তে কিছু বলা যাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কুসুমদিকে ডেকে দিতে বললেন আর বললেন — অনিল সেন কি এসেছে?

(একজন একতলা থেকে খবর নিয়ে এসে বললো যে অনিল সেন এখনও এসে পৌঁছায়নি।)

শ্রীশ্রীঠাকুর- অনিল সেন আসলে যেন উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। (তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে) হরিশ কি খেয়ে গেছে? (রান্নাঘর থেকে খবর নিয়ে জানা গেলো যে হরিশ খেয়ে গেছে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর- এই হরিশ কতো ছোটোবেলায় আমার কাছে আসতো। আমরা যেখানে থাকতাম সেই কৃষ্ণনগরের কাছে কালমিনা বলে একটা জায়গায় ও থাকতো। ওর এক জ্যাঠার উজানচরের হাটে কাপড়ের দোকান ছিলো। আমার বাবা, তারপর মাস্টারমশাই প্রকাশ বল, তারপর ঐ কাছারির বিশ্বেশ্বর ঘোষ এরা সবাই বিকালের দিকে মাঝে মাঝে ওর জ্যাঠার দোকানে বসে গল্প করতো। একবার ওর এক মাসতুতো না পিসতুতো দিদিকে সাপে কামড়ে ছিলো, আমার কাছে নিয়ে এসেছিলো। হরিশ ভালো ফুটবল খেলতো। বাঞ্ছারামপুরে একবার ফুটবল টুর্নামেন্টে খুব ভালো খেলেছিলো। একবার রাত্রিবেলা বৃষ্টির জন্য ও বাড়ি ফিরতে পারলো না, আমাদের বাড়িতেই রয়ে গেলো, মা খুব যত্ন করে রান্নাবান্না করে ওকে খাওয়ালো। সেদিন মাছ রান্না হয়নি, তাই হাইরাকে ডেকে মা আবার মাছ নিয়ে এসে রান্না করলো। রাত্রে তো আমার সেই বেড়ার ঘরে ও শুয়েছে। আমি তো কাজে বসেছি, ও একটু দূরে ঘুমাচ্ছে। মনাই ফকির তখন আমার কাছে গভীর রাত্রে আসতো। মনাই ফকির লোকের ভিড়ের মধ্যে আসতে চাইতো না, তাই রাত্রে আসতো। মনাই ফকির ঘরে ঢুকে ওকে ঘুমাতে দেখে একটু অবাক হয়ে গেছে। তারপর কাজে বসেছে।

কালিদাস- মনাই ফকির এরকম কতোদিন তোমার কাছাকাছি ছিলো?

শ্রীশ্রীঠাকুর- বেশ কিছুদিন ছিলো, তারপর আমিই পাঠিয়ে দিলাম।

কালিদাস- তুমি তো সেদিন কি সুন্দর মনাই ফকিরের গান করছিলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর- মনাই ফকির খুব ভালো গাইতো। আমি ওর মতো গাইতে পারিনি, কিছুটা করেছি। ও তো আফতাবুদ্দিন, আলাউদ্দিন, তারপর এই যে বাহাদুর খাঁ আসে, বাহাদুরের বাবা আয়েৎ আলি — এদের গুরু ছিলো। মনাই ফকির খুব বড় সাধক ছিলো। আমাকে খালি বলতো, এই বাচ্চা, আমার আজ্ঞাচক্রটা ফাটাইয়ে দে।

কালিদাস- আচ্ছা ঠাকুর, একটা প্রশ্ন করবো? এই যে কয়েকদিন ধরে তুমি কলমের গাছের কথা বলছো ইনি কি মনাই ফকিরের থেকেও বড় হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর- আলোচনা হচ্ছিলো অন্য প্রসঙ্গ, এটা তো অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলো।

কালিদাস- এমনি মনে হলো তাই বললাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর- এই প্রসঙ্গে আলোচনা না করাই ভালো। প্রকৃতি থেকেই যে বিষয়বস্তুকে আড়ালে রাখা হয়েছে সেটাকে আড়ালেই থাকতে দেওয়া উচিৎ। এসব কথা বাইরে আলোচনার নয়। কাছে আছো বলে দু-একটা কথা বলি। এটা তোমাদের জানারও বিষয় নয়, আমার জানানোরও বিষয় নয়।

কালিদাস- তুমি না চাইলে বলতে হবে না।

কুসুমদি- বলো না ঠাকুর।

শ্রীশ্রীঠাকুর কুসুমদির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন রায়দা যে রাত্রে শিবপুর থেকে আসবে সেটা কুসুম জানে কিনা। কুসুমদি বললো যে সে রায়দার আসার ব্যাপারে জানে এবং আবার জিজ্ঞাসা করলো কলমের গাছ নিয়ে কিছু বলতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর- আমার কলমের গাছ বিশ্বপ্রকৃতির এক আশ্চর্য্য কাজের জন্য আসছে। এটা আজকের ব্যাপার নয়। অনেক দিনের, অনেক চিন্তাভাবনার একটা শেষ result এই কলমের গাছ। এখানে যে ক্ষমতাগুলোর পরিচয় তোমরা পাচ্ছো, সেটা কোনো না কোনো ভাবে অর্জন করতে হয়। ক্ষমতার মধ্যেও আবার দেখো কতো ভাগ। ধরো কেউ নিজের মনে ব্যায়াম করে চলেছে, এইভাবে করতে করতে সে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলো। বা ধরো ব্যবসা করে অনেক টাকা রোজগার করলো এবং খুব অর্থবান হয়ে উঠলো। এটা হলো এক ধরণের ক্ষমতা। আবার আরেক ধরণের ক্ষমতা, যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা সেটা আবার তোমার শুধু একার ইচ্ছা থাকলে হবে না, অনেকের সম্মতি সেখানে দরকার। ব্যায়ামটা তুমি ঘরের কোণে একা একা করতে পারো, কে তোমাকে কিভাবে দেখছে সেটা ভাবার সেখানে দরকার নেই। কেউ তোমাকে পছন্দ করে, বা কেউ করে না এর জন্য তোমার ব্যায়াম করে ক্ষমতালাভ কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা তুমি তখনই পাবে যখন বেশীর ভাগ লোক তোমাকে সমর্থন করবে। যেমন মুখ্যমন্ত্রী বা

প্রধানমন্ত্রী যে হয় — এখানে শুধু তোমার একার ইচ্ছা থাকলেই হবে না, majority-র support পেলে তবেই তুমি সেটা পাবে। এই বিশ্বের যে spiritual power সেখানেও অনেকটা এরকমই। একদল হলো সাধক, তারা সাধনার দ্বারা খুব বড় বড় হয়ে যাচ্ছে, ধরো দেবতা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আরও বড় বড় যারা হয়ে গেছে, তারা বিশাল বিশাল পুরুষ হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে আবার নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক করা হয় কে শ্রেষ্ঠ। এখন আবার যদি একই সাথে দেখা গেলো বেশ কয়েকজন একই মাত্রার হয়ে গেছে, তখন আবার তাদের record এর পরীক্ষা দিতে দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়। যেভাবেই হোক না কেন, সে যতো বড়ই হোক না কেন তাকে ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। কিন্তু এই বিশ্বসৃষ্টির চূড়ান্ত পরিণতির কথা ভেবে এমন একজনের কথা ভাবা হলো যাকে কোনোকিছুই কোনোদিন অর্জন করতে হবে না। এই চিন্তা থেকেই কলমের গাছের ভাবনা। তাই সে সবার উপরে থাকবে, সব আইনের ঊর্দ্ধে থাকবে। যেমন এই যে দুর্গাপূজার মহালয়ার যে পাঠ সেখানে কি যেন আছে না, যে দুর্গাকে অমুক দেবতা এই দিলো, তমুক দেবতা এই দিলো — এই সব কিছু সবার শ্রেষ্ঠ জিনিষগুলো দিয়ে দুর্গা তৈরী হলো। এটা যেরকম হলো, তাকে তো কোনো সাধনা করে অর্জন করতে হলো না, সে সবার শ্রেষ্ঠ জিনিষগুলো পেলো। কারণ আলাদা আলাদা ভাবে যা করা সম্ভব হচ্ছিলো না, সেটা একসাথে হলো এবং সেটা থেকে সবার একটা সম্মিলিত শক্তি একটা রূপ নিয়ে দাঁড়ালো। আমার কলমের গাছও হবে সেরকম। এবার কিছুটা বুঝতে পেরেছো তো?

কালিদাস- সে কি মানুষের রূপ নিয়ে আসবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর- হ্যাঁ খোলটা তো মানুষেরই থাকে, তারপর যতো দিন যাবে আস্তে আস্তে সে আপনা আপনিই তৈরী হতে থাকবে। তার জন্মটাই হবে এই রূপটা নেওয়ার জন্য।

কালিদাস- আমরা তাকে দেখতে পাবো না?

শ্রীশ্রীঠাকুর- এটা আমি কিভাবে বলবো। আগেই তো বললাম প্রকৃতির কতো বড় উদ্দেশ্যে সে আসছে তোমরা সেটা এখন কল্পনাতেও আনতে পারবে না। এই পরিবেশের মধ্যেই সে থাকবে, কিন্তু এই পরিবেশ চিন্তার দিক থেকে এতোটাই পিছিয়ে আছে যে অন্য পরিবেশের থেকে নিয়ে আসার ভাবনা চলে আসে।

কালিদাস- ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর- তোমরা যে এসেছো, কোথা থেকে এসেছো? তোমরা তো বলো যে সূর্য্যের ঔরষে পৃথিবীর গর্ভে তোমাদের জন্ম। তাহলে যতোদিন থেকে সূর্য্য এসেছে, তারপর পৃথিবী এসেছে — তোমরা এই পরিবেশে জন্ম নিয়েছো — তারপর থেকে একবার করে জন্মগ্রহণ করছো, তারপর মরছো — আবার জন্মাচ্ছো, আবার মরছো — এই খালি চলেছে কোটি কোটি বছর ধরে, এরকম যে আরও কতো কোটি বছর চলতো কে জানে। আমার সাথে মাঝখানে দেখা হওয়াতে আমি চেষ্টা করছি কিভাবে এই চক্রের

বাইরে তোমাদের নিয়ে ফেলা যায়। তার মানে কি দাঁড়ালো — এই পরিবেশ ব্যর্থতার পরিবেশের মতো হয়ে গেছে। সফলতা লাভ করার সব উপাদান থাকা সত্ত্বেও এই পরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে না উঠতে পারার জন্য তোমরা আর সফল হতে পারছো না। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি আসল বিষয়বস্তু ভুলে একেবারে নকলের পিছনে দৌড়ে মরছো। তাই যে পরিবেশ এই ব্যর্থতার, সেই পরিবেশে কলমের গাছ হয়ে যে আসবে তার উপর যাতে এই পরিবেশের কোনো প্রভাব না পড়ে তার জন্য সূর্য্যের ঔরষে পৃথিবীর গর্ভে যেভাবে তোমরা এসেছো সেভাবে যাতে না আসে সেরকম চিন্তাও করা হয়েছে। ধরো, কথার কথা বলছি, বহুদূরের অনেক দূরের বিশাল বড় কোনো সূর্য্যের, যে সূর্য্য সফলতার সূর্য্য — সেরকম কোনো সূর্য্য থেকেই সে আসলো। এই যে ধূমকেতুগুলো আসে সেগুলো কতো দূর দূর হয়ে আসে জানো? এটা বলছি বলে যে এরকমই হতে হবে, তার কোনো মানে নেই। আমি শুধু এটাই বলছি যে এরকম আলোচনাও বিশাল বিশাল পুরুষ — যাদের প্রার্থনায় কলমের গাছের আসা — তাদের মধ্যে এরকম আলোচনাও হয়েছে। তারাই আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে সেই কলমের গাছকে তৈরী করে দিতে। তার মাধ্যমেই আমার প্রকাশটা তাদের কাছে পৌঁছে যাবে।

কালিদাস- কলমের গাছ তো তাহলে সব দেব দেবীর ঊর্দ্ধে।

শ্রীশ্রীঠাকুর- দেব দেবী তো সব সাধনা করে হয়েছে। আর ও তো দুর্গা যেমন সব দেব দেবীর শ্রেষ্ঠ জিনিষগুলো নিয়ে হয়েছে, আমার কলমের গাছও ঠিক সেরকম হবে। ও তো আমারটাও পাবে।

কালিদাস- তুমি তো একেবারে বিশাল জায়গায়, একেবারে তোমার জায়গায় কলমের গাছকে বসিয়ে দিলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর- বিশাল জায়গা, ছোটো জায়গার কোনো বিষয় নয় এটা। কাজটা হওয়া নিয়ে কথা। ধরো একজনের বাবা একসময় ওপার বাংলা থেকে সব হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে এই বাংলায় আসলো। তারপর অনেক কষ্ট করে, শিয়ালদা স্টেশনে মুটেগিরি করে, তারপর গামছা বিক্রি করে — এইসব করে, অনেক কষ্ট করে একদিন টাকা রোজগার করে একতলা একটা বাড়ি করলো। এখন তার ছেলে তো জন্ম থেকেই সেই বাড়ির মালিক হয়ে গেলো। সেই ছেলেকে কি আবার প্রথম থেকে, সেই ওপার বাংলা থেকে ওর বাবা যা যা করেছে সেইসব করতে হবে? সে তো জন্মেই তার বাবার তৈরী করা বাড়ির উত্তরাধিকার হয়ে গেলো। এবার সে যখন বাড়িতে হাত দেবে তখন কিন্তু দোতালা থেকেই শুরু করবে। অর্থাৎ তার বাবা যেখানে শেষ করেছে, ছেলে কিন্তু সেখান থেকেই শুরু করবে। এইভাবেই তো একেকটা পরিবার বড় হয়ে ওঠে।

কালিদাস- সে কবে আসবে তুমি কি একটু বলতে পারো না?

শ্রীশ্রীঠাকুর- এটা আমার দেখার কথা নয়। কারণ বিশ্বপ্রকৃতি থেকে অনন্ত শক্তির

উত্তরাধিকার হয়ে সে আসবে। তার আসার একটাই উদ্দেশ্য — অনন্ত সৃষ্টির মহান সফলতার চূড়ান্ত যে ফল — তার দিক নির্দেশ করা। একদিকে আমার রেকর্ড চলছে, আরেক দিকে তাকে তৈরী করার দায়িত্ব। তাই আড়ালে তাকে রাখতেই হবে। তবে তার ভূমিষ্ঠ হবার বার্তা আসছে। আমি চাইবো বিশ্বপ্রকৃতির ইঙ্গিত অনুযায়ী তাকে যতোটা সম্ভব ততোটা আড়ালে রাখতে। তাকে বুঝতে দেওয়া চলবে না সে কি হতে চলেছে। তাকেও যেমন বুঝতে দেওয়া চলবে না সে কে, অন্যদেরও বুঝতে দেওয়া হবে না। কারণ তাতে কাজের পথে, তৈরীর পথে বিঘ্ন আসতে পারে। তবে কেউ যদি তাকে চিনে নিতে পারে সেখানে কিছু বলার নেই। তবে খুব সাবধানে তাকে রাখতে হবে। কারণ তোমাদের রোগ শোক যেমন আমি ভালো করে দিই কিন্তু নিজের জন্য কিছু করতে গেলেই আমার record-এ spot পড়ে যাবে। আমার কলমের গাছ হয়ে যে আসবে, সে যেহেতু আমারই একটা অংশ হবে তাই তার ক্ষেত্রেও অর্থাৎ তার কোনো অসুখ বিসুখে যদি আমি হস্তক্ষেপ করি তাহলে তার জন্য আমার record-এ spot পড়বে। তাই তাকে এতো সাবধানে রাখা।

কালিদাস- আমার খুব ইচ্ছা যেন তাকে দেখতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর- জানি না তোমাদের কার কার সাথে তার দেখা হবে। তবে যারা তাকে চিনে নিতে সক্ষম হবে তারা যে কতো বড় মহাভাগ্যের অধিকারী হবে সেটা নিজেরাও কল্পনা করতে পারবে না। এখানে বলে দেবদর্শনে সিদ্ধি মুক্তি সব হয়, আর দেবতারা স্বয়ং যাকে পাঠাচ্ছে, দেবতারা যাকে পূজা করার জন্য বসে আছে তার দর্শনে কি যে হতে পারে আর না পারে তা ভাবনাতেই আনতে পারবে না। তার কথা ভাবলে আমার চোখেও জল আসে, আমিও অপেক্ষা করছি তার জন্য। জানি না কবে দেখা হবে। এখানকার কোনো আইনেই তাকে আটকানো যাবে না, কোনো আইনের প্রভাবই তার উপর পড়বে না। সেই শিশুবয়স থেকে কতো কঠিন আইনের মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে, কিন্তু তার উপর কোনো আইনেরই খবরদারি চলবে না। আইনের পথ দিয়ে গেলে অনেক জিনিষ করা হয়ে ওঠে না, সেসব ক্ষেত্রে ওর ইচ্ছাই আইন রূপে কাজ করবে। দেহী জগৎ, বিদেহী জগৎ, আরও যেসব জগৎ আছে — সব জগতেই তার ইচ্ছাটাই আইন রূপে থেকে যাবে। সেখানে কোনো তর্ক চলবে না। কারণ তর্ক যারা করার তারাই তো তাকে পাঠাচ্ছে। তাই তার সাথে তর্ক বিতর্ক চলবে না। সে আপন ভোলা শিশুর মতো পৃথিবীর পথে পথে চলে ফিরে খেলে বেড়াবে, যে পথ দিয়ে সে যাবে, তার চলে যাওয়ার পরে সেই পথের ধূলাকে প্রণাম করে দেবতারা পর্য্যন্ত ধন্য হয়ে যাবে। (এইসময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মা ও মাসী শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা করার জন্য উপস্থিত হওয়ায় আলাপ বন্ধ হয়।)

রাম নারায়ণ রাম

## 155, Park Street
## 7-11-1967
## 3.00 p.m.

ঠাকুর আজ সকাল থেকে সমাধিমগ্ন ছিলেন। বিকেল তিনটার সময় ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হয়। তারপর প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করবার পর এই সংক্ষিপ্ত আলাপটি ঠাকুর করেছিলেন।

ঃঃবেদমন্ত্রঃঃ বহু বছর পরে পরে যেমন একটা গ্রহের সঙ্গে আর একটা গ্রহের যোগাযোগ হয়, সেইরকম একটা বিরাট শুভ ইচ্ছাশক্তি বহু সহস্র বছর ধরে আকাশপথে ঘুরে ঘুরে চলেছে। সেই ইচ্ছাশক্তিটিকে যেন মৌচাকের মতো পৃথিবীর বুকে চাক বাঁধার জন্য তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে। যদিও কথাটা একটু কল্পনার মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু কল্পনা নয়। ফুলের গন্ধ অনেক দূর থেকেই পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা কল্পনা নয়। রেডিও যন্ত্রে যেমন অনেক দূরের শব্দ ধরা পড়ে, তেমনি প্রকৃতির এক শুভ ইচ্ছাশক্তি মনের যন্ত্রে এসে সাড়া দিচ্ছে। আমি সেই আগমনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আজ ষষ্ঠী তিথি, ষষ্ঠীপুজো, আমাদের দেশের বাড়িতে কার্তিক মাসের এই ষষ্ঠী তিথির দিনটাকে খুব শুভ বলে মান্য করে আসা হয়েছে। আমার অন্যান্য ভাইবোনেরা, তাদের সবার জন্ম মামাবাড়ি দোগাছিতে হয়েছিল। শুধু আমার জন্ম হয়েছে আমার বাবা জ্যাঠার বাড়িতে, মেদিনীমণ্ডলে। আমার মা তখন সন্তানসম্ভবা, আমার ঠাকুমা চেয়েছিলেন সন্তান যেন ছেলে হয় আর তার জন্ম যেন ষষ্ঠী তিথিতে হয়। কিন্তু আমার জন্ম হয়েছিল কালীপূজার দিন, ষষ্ঠীর আগেই। আজ সেইসব কথা মনে পড়ছে। আজকের দিনটাও তো ষষ্ঠীতিথি, আবার মঙ্গলবার, তার উপর সূর্যপূজার দিন, খুবই শুভ। (প্রফেসর পি. কে. রায় বললেন, বাংলা তারিখ মতে আজ ২৩শে কার্তিক, তোমার জন্মদিন।)

ঠাকুর চোখ বন্ধ করে বসে রয়েছেন। দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সামনে উপস্থিত ধীরেনজ্যোতি শাস্ত্রী। (এই ক্লাসটির লিখিত মূল অংশটি ধীরেনজ্যোতি শাস্ত্রীর থেকেই প্রাপ্ত) জানতে চাইলেন ঠাকুরের যিনি ঠাকুমা ওনার নাম কি রাজলক্ষ্মী দেবী?

প্রফেসর পি. কে. রায় উত্তর দিলেন, না, রাজলক্ষ্মী দেবী হলেন ঠাকুরের দিদিমা। ঠাকুরের ঠাকুমা হলেন শশীমুখী দেবী।

কিছুক্ষণ পর ঠাকুর চোখ খুললেন ও বললেন ঃঃবেদমন্ত্রঃঃ আজ সূর্যপূজা, সূর্য বিশ্বের তেজের প্রতীক, সেই পরম তেজকে স্মরণ করছি, তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সেই পরম তেজ নতুন আলোর সন্ধান নিয়ে এসেছে, তাঁর আলোতে নতুন পথের সৃষ্টি হোক। যে রহস্যের সমাধান আজও হয়নি, সৃষ্টির সেই শেষ রহস্যের শেষ সমাধান তাঁর স্পর্শেই

হোক আমি চাই। সৃষ্টির চূড়ান্ত পরিণতির চরম সমাধানের চাবি হাতে নিয়েই তাঁর আগমন হলো। অনেকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে কারণ সে সব নিয়মের বাইরে থেকে এসেছে। একটু আগে যে ইচ্ছাশক্তির চাক বাঁধার কথা বলা হলো সেটাও মনে হয় ওঁরই কারণে এই পৃথিবীতে জমাট বাঁধতে চাইছে। যাঁরা চেতনার অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় চলে গেছে, দেবতারাও যাঁদের নাগাল পায় না সেই সকল উচ্চতম মহানেরাও ওঁর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছে, কারণ কোনও নিয়মের বাঁধনে সে বাঁধা পড়ে নেই, সে সকল নিয়মের ঊর্দ্ধে ঃঃবেদমন্ত্রঃঃ

ওঁর সামান্য খুশিতে অনেক জটিল পথ মুহূর্তে সহজ হয়ে যাবে। বিশ্বে উন্নতি লাভের যে পথ এতদিন খুবই কঠিন ছিলো সেই পথ ওঁরই ইচ্ছাতে খুব সহজ হয়ে যাবে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ জন্মের যে কাজ সেটা ওঁর ইচ্ছাতে, ওঁর খুশিতে এক জন্মেই সমাধান হয়ে যাবে। অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের সবচেয়ে জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধান এবং সুরাহা করবার ক্ষমতা নিয়ে তাঁর আগমন হলো। সিদ্ধি মুক্তি মোক্ষ নির্বাণ এইসব তো অতি সামান্য বিষয়, এর থেকে অনেক বেশি, আরও অনেক বড় কিছু ওঁর থেকে পাওয়া যাবে। বিশ্বের যে কোনও পরিস্থিতি নিজের খুশিতে নিজের নিয়ন্ত্রণে ও নিয়ে আসতে পারবে, তার জন্য কারুর কাছে ওঁকে জবাবদিহি করতে হবে না।

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকবার পর ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন — কালিদাস কোথায়? প্রফেসর পি. কে. রায় উত্তর দিলেন, তোমার মামাবাড়ি পটলডাঙ্গা স্ট্রীটে আজ কালিদাসের যাওয়ার কথা, ওখান থেকে নিবারণবাবুদের নিয়ে শ্যামবাজার বাড়ি যাবে, তারপর এখানে আসবে। কুসুমদি এই সময় ঠাকুরকে বললেন — সকাল থেকে তোমার কিছু খাওয়া হয়নি, আগে কিছু খেয়ে নাও।

রাম নারায়ণ রাম

শূন্যজ্যোতি